পূষণ গুপ্তকে

গ্রন্থকারের রচিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১. প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন। ২. কুমুদরঞ্জনের কাব্য-বিচার। ৩. সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার। ৪. মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য-শিল্প। ৫. নাট্যকার মধুসূদন। ৬. কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী। ৭. মধু-বিচিত্রা। ৮. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি। ৯. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস [১ম খণ্ড]। ১০. বঙ্কিমচন্দ্র, বাস্তবতা এবং। ১১. রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। ১২. রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব। ১৩. Structures and Variations / Novels of Tagore. ১৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস। ১৫. সংযোগের সন্ধানে, লোকসংস্কৃতি। ১৬. বাংলা উপন্যাসের আলোচনা। ১৭. বাংলা নাটকের আলোচনা [বই দুটি ড. জ্যোৎস্না গুপ্তের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত।] ১৮. মধুসূদনের রচনাবলী [ইংরেজীসহ সমগ্র]। ১৯. দীনবন্ধু রচনাবলী [সমগ্র]। ২০. হেমচন্দ্রের নির্বাচিত রচনাবলী। ২১. ভারতচন্দ্রের রচনাসমগ্র। ২২. শ্রীচৈতন্য : একালের দৃষ্টিকোণ। ২৩. বঙ্কিমী রঙ্গ-ব্যঙ্গ। ২৪. বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন। ২৫. বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্র। ২৬. বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ-সমস্যা। ২৭. কবি মুকুন্দরাম। ২৮. সেকালীন ব্যঙ্গ কবিতা। ২৯. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী [দুই খণ্ড]। ৩০. বঙ্গীয় নাট্যশালা [ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় রচিত]। ৩১. গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'। ৩২-৫০. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্প [২য় খণ্ড]। ৫১. দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'। ৫২. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'। ৫৩-৬০. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিশোর কাহিনী [৮ খণ্ড]।

সাংস্কৃতিক সংযোগ অর্থাৎ কালচারাল কমিউনিকেশন নিয়ে অনেক দিন থেকে ভেবেছি, কিন্তু লেখালেখিও হয়েছে। এ সম্পর্কে আমার ছেলে পূষণ আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে রেখেছে গত দশ বছর। 'বাংলা থিয়েটার ও সংযোগ-সমস্যা' নিয়ে তার পি. এইচ. ডি.।

বইটির প্রকাশনার দায়িত্বে থেকে ড. সনৎকুমার মিত্র আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রেখেছেন। ড. রবীন্দ্র গুপ্ত, ড. পল্লব সেনগুপ্ত এবং ড. দুলাল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হয়েছি।

বইটি ছাপার সময় যে নাম রেখে-ছিলাম, প্রকাশ করতে গিয়ে সেটা পাল্টে দিলাম।

ক্ষেত্র গুপ্ত

সূচীপত্র

প্রস্তাব : ১.

□ বীক্ষণ, বাতায়নিকের □

> 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।...
> অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
> সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।' [রবীন্দ্রনাথ]

সংযোগ একটি আধুনিক সমস্যা। এবং পাঠকদের কাছে নিবেদন—সংযোগ শব্দ আমি কমিউনিকেশনের বাংলা হিসেবে ব্যবহার করেছি, মাস-কমিউনিকেশনের বাংলা ধরে নিয়েছি গণ-সংযোগ। জানিনা পরিভাষা রূপে শব্দটি এখনও যোগ্য বিবেচিত হয়েছে কিনা। ব্যাপক সচেতন ভাবনায় আধুনিক কালে, বলা যায় সম্প্রতি বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। উপগ্রহ ও মাইক্রোওয়েভ সংযোগ সংক্রান্ত আবিষ্কার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সত্যই বিপ্লব ঘটিয়েছে। তার প্রেক্ষিতে সমস্যাটি একান্তই আধুনিক। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে প্রতি শিল্পীকে চিরকাল এর সমাধান খুঁজতে হয়েছে। অস্পষ্ট সামাজিক ভাবনা হিসেবে প্রশ্নটি আমাদের দেশেও ক্বচিৎ উচ্চারিত হয়েছে। তবুও সংযোগ-সমস্যা বিশেষভাবে একালের জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক সমাধান দেশ-নিরপেক্ষ। একদেশ থেকে দেশান্তরে তার আমদানি-রপ্তানি সহজেই ঘটছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সংযোগের সমস্যা প্রতি দেশ ও জাতির নিজস্ব। প্রশ্নগুলির উত্তর প্রত্যেককে নিজের মতো করেই পেতে হবে।

লোকায়ত শিল্প-সাহিত্য-নাট্যাদি কিভাবে সংযোগ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিল, অথবা সেখানে কেন সংযোগ কোনো সমস্যা হয়ে ওঠেনি, তার বিচার-ব্যাখ্যা করতে বসে প্রথমেই ভাবা দরকার কোথায় দাঁড়িয়ে সে বিশ্লেষণ।

সংযোগের যে সব দিক একালে নানাভাবে সত্য তার কোথায় অবস্থান আমাদের। এই দেখা হয়ত বাতায়নিকের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের কাছে লোকায়ত সংস্কৃতি দূরে দাঁড়িয়ে দেখবার, আলোচনার, গবেষণার বস্তু। আমি যদি ব্যক্তিগত ভাবে একজন বাউল গায়ক, ছৌ-নর্তক কিংবা সত্যপীরের কিস্‌সার দোহার হতাম অথবা হতাম কোনো গ্রামীণ, যাদের মধ্যে এদের জন্ম ও বিস্তার, তাহলে বিষয়টিকে ঠিক এভাবে দেখতাম কিনা বলতে পারব না। কিন্তু এই চিন্তা আমাকে সংশয়মূঢ় করে না। আমার চিন্তা আমারই। যদিও ভেতর দিক থেকে ব্যাখ্যা হলে তা কি রকম হত তা জানাতে আমি আগ্রহী এবং তাকে দাম দিতেও।

● ১. মান এবং জনসাধারণ

আমরা একালের মানুষেরা নিয়ত বিচ্ছিন্নতায় ভুগি এবং প্রতিক্ষণ সংযোগের সাধনা করি, সংযোগের স্বপ্ন দেখি। আমাদের সাহিত্য যতই আধুনিক হচ্ছে, জটিল ও বিচিত্র হচ্ছে, ততই জনগণ দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা সেতুবন্ধন চাই সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্য—একটা সভ্যতার পুষ্পিত এই প্রকাশ যেন মুছে না যায়।[১] আমাদের নাটক যত বুদ্ধিদীপ্ত ও চতুর হচ্ছে, গ্রুপ থিয়েটারের সংখ্যা বাড়ছে যত, তার সারা গায়ে মার্জিত দ্যুতি—তার দূরত্ব জনসাধারণ থেকে আরও দুস্তর হচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, এরা জনসাধারণের, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের দুঃখদুর্দশার কথা, সংগ্রামের কথা বলে। অথচ মোটা দাগের ব্যবসায়িক থিয়েটারের চারপাশে ভিড় জমানো শহুরে মানুষজন থেকেও এই নাটক দূরবর্তী। সাহিত্য শিল্পের জগতে মান যত বাড়ে, ততই কি বাড়ে এই বিচ্ছিন্নতাও? কাজ যত সূক্ষ্ম হয়, তা কি আরও কম—আরও কম মানুষের অধিকারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে? যাঁরা বাজারে বিকোন না তাঁরা এবং যাঁরা বাজারে বিকোতে চান না তাঁদের কেউ নাক উঁচিয়ে বলেন, খুব কম আমার নিমন্ত্রণ, কিন্তু অনেক যত্নে বাছাই করা। এদেশের গণতান্ত্রিকতা এ-ধরনের আভিজাত্যের লুব্ধ পূজারী।

আজকাল যে যাত্রাভিনয়, শুনেছি তা ভালো ইন্‌ডাস্ট্রি। সেটা শিল্প-বিরল দেশের পক্ষে সুখবর। এবং তার মূলে বিপুল গণসংযোগ। সেই যাত্রায় লোকাশ্রয়ী থিয়েটারের রীতিনীতি বেঁচে আছে সামান্যই। সামনে ড্রপ নেই, প্রায় চারধার ঘিরে দর্শকেরা বসে। নেই পেছনে পট, পাশে উইংস-এর মতো বালাই—আলোর কারিগরি, মঞ্চমায়া রচনার চেষ্টা। [যদিও সে সবও মাঝে

গণসংযোগ এবং লোকসংস্কৃতি

ক্ষেত্র গুপ্ত

প্রস্তাব : ১.

□ বীক্ষণ, বাতায়নিকের □

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।...
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।' [রবীন্দ্রনাথ]

সংযোগ একটি আধুনিক সমস্যা। এবং পাঠকদের কাছে নিবেদন—সংযোগ শব্দ আমি কমিউনিকেশনের বাংলা হিসেবে ব্যবহার করেছি, মাস-কমিউনিকেশনের বাংলা ধরে নিয়েছি গণ-সংযোগ। জানিনা পরিভাষা রূপে শব্দটি এখনও যোগ্য বিবেচিত হয়েছে কিনা। ব্যাপক সচেতন ভাবনায় আধুনিক কালে, বলা যায় সম্প্রতি বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। উপগ্রহ ও মাইক্রোওয়েভ সংযোগ সংক্রান্ত আবিষ্কার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সত্যই বিপ্লব ঘটিয়েছে। তার প্রেক্ষিতে সমস্যাটি একান্তই আধুনিক। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে প্রতি শিল্পীকে চিরকাল এর সমাধান খুঁজতে হয়েছে। অস্পষ্ট সামাজিক ভাবনা হিসেবে প্রশ্নটি আমাদের দেশেও ক্বচিৎ উচ্চারিত হয়েছে। তবুও সংযোগ-সমস্যা বিশেষভাবে একালের জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক সমাধান দেশ-নিরপেক্ষ। একদেশ থেকে দেশান্তরে তার আমদানি-রপ্তানি সহজেই ঘটছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সংযোগের সমস্যা প্রতি দেশ ও জাতির নিজস্ব। প্রশ্নগুলির উত্তর প্রত্যেককে নিজের মতো করেই পেতে হবে।

লোকায়ত শিল্প-সাহিত্য-নাট্যাদি কিভাবে সংযোগ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিল, অথবা সেখানে কেন সংযোগ কোনো সমস্যা হয়ে ওঠেনি, তার বিচার-ব্যাখ্যা করতে বসে প্রথমেই ভাবা দরকার কোথায় দাঁড়িয়ে সে বিশ্লেষণ।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও ইউ. জি. সি. জাতীয় লেকচারার [১৯৮৯]। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর সভাপতি।

সংযোগের যে সব দিক একালে নানাভাবে সত্য তার কোথায় অবস্থান আমাদের। এই দেখা হয়ত বাতায়নিকের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের কাছে লোকায়ত সংস্কৃতি দূরে দাঁড়িয়ে দেখবার, আলোচনার, গবেষণার বস্তু। আমি যদি ব্যক্তিগত ভাবে একজন বাউল গায়ক, ছো-নর্তক কিংবা সত্যপীরের কিস্‌সার দোহার হতাম অথবা হতাম কোনো গ্রামীণ, যাদের মধ্যে এদের জন্ম ও বিস্তার, তাহলে বিষয়টিকে ঠিক এভাবে দেখতাম কিনা বলতে পারব না। কিন্তু এই চিন্তা আমাকে সংশয়মূঢ় করে না। আমার চিন্তা আমারই। যদিও ভেতর দিক থেকে ব্যাখ্যা হলে তা কি রকম হত তা জানাতে আমি আগ্রহী এবং তাকে দাম দিতেও।

● ১. মান এবং জনসাধারণ

আমরা একালের মানুষেরা নিয়ত বিচ্ছিন্নতায় ভুগি এবং প্রতিক্ষণ সংযোগের সাধনা করি, সংযোগের স্বপ্ন দেখি। আমাদের সাহিত্য যতই আধুনিক হচ্ছে, জটিল ও বিচিত্র হচ্ছে, ততই জনগণ দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা সেতুবন্ধন চাই সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্য—একটা সভ্যতার পুষ্পিত এই প্রকাশ যেন মুছে না যায়।[১] আমাদের নাটক যত বুদ্ধিদীপ্ত ও চতুর হচ্ছে, গ্রুপ থিয়েটারের সংখ্যা বাড়ছে যত, তার সারা গায়ে মার্জিত দ্যুতি—তার দূরত্ব জনসাধারণ থেকে আরও দুস্তর হচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, এরা জনসাধারণের, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের দুঃখদুর্দশার কথা, সংগ্রামের কথা বলে। অথচ মোটা দাগের ব্যবসায়িক থিয়েটারের চারপাশে ভিড় জমানো শহুরে মানুষজন থেকেও এই নাটক দূরবর্তী। সাহিত্য শিল্পের জগতে মান যত বাড়ে, ততই কি বাড়ে এই বিচ্ছিন্নতাও? কাজ যত সূক্ষ্ম হয়, তা কি আরও কম—আরও কম মানুষের অধিকারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে? যাঁরা বাজারে বিকোন না তাঁরা এবং যাঁরা বাজারে বিকোতে চান না তাঁদের কেউ নাক উঁচিয়ে বলেন, খুব কম আমার নিমন্ত্রণ, কিন্তু অনেক যত্নে বাছাই করা। এদেশের গণতান্ত্রিকতা এ-ধরনের আভিজাত্যের লুব্ধ পূজারী।

আজকাল যে যাত্রাভিনয়, শুনেছি তা ভালো ইন্‌ডাস্ট্রি। সেটা শিল্প-বিরল দেশের পক্ষে সুখবর। এবং তার মূলে বিপুল গণসংযোগ। সেই যাত্রায় লোকাশ্রয়ী থিয়েটারের রীতিনীতি বেঁচে আছে সামান্যই। সামনে ড্রপ নেই, প্রায় চারধার ঘিরে দর্শকেরা বসে। নেই পেছনে পট, পাশে উইংস-এর মতো বালাই—আলোর কারিগরি, মঞ্চমায়া রচনার চেষ্টা। [যদিও সে সবও মাঝে

মধ্যে আমদানি হচ্ছে]। বাংলার গ্রামের অগণিত মানুষ তবুও একে নিচ্ছে। শহরবাসীর কাছেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। আসলে বাণিজ্যিক রঙ্গালয়গুলির ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্র জোগাড় করে, তাকে বাড়িয়ে তোলা ফেনিয়ে তোলা আবেগে, অভিনয়ে, পরিস্থিতি তৈরিতে, নাট্য-মুহূর্ত নির্মাণে।

যদি গণ-সংযোগ চাও তো সৃষ্টিকে করে তোল নির্বোধ ও স্থূল—নিরুচ্চার অনুভূতিকে উঁচু চিৎকারে পরিণত কর, ইঙ্গিতগুলি ঘষে তুলে উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটাও।

আমাদের দুশ্চিন্তা—আধুনিক শিল্প-সাহিত্য বা নাট্য-সঙ্গীত এবং চিত্র যদি তার সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলের বাইরে আসতে চায় তাকে কি উঁচু মান থেকে নেমে আসতেই হবে ? অন্য পথ নেই ? যত নামবে ততই বাড়বে গণসংযোগ ? অথবা গণচেতনাকে টেনে তুলতে হবে উঁচু সূক্ষ্ম শিল্পবোধের দিকে ? আর সে কাজও একান্ত অসম্ভব বলেই একটা রফা করতে হবে। খুঁজতে হবে মান ও জনগণের মধ্যবর্তী কোনো অবস্থান—মান কিছু বর্জন করে, কিছু রেখে আংশিক গণ-সংযোগে খুশি থাকা।
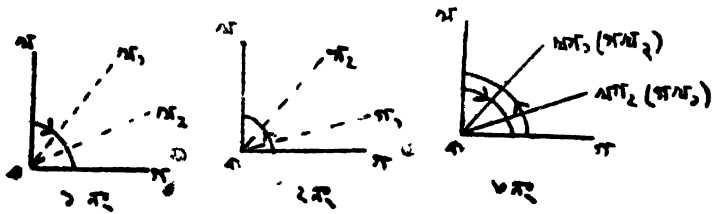
নকসা—এক

উপরের নক্সার তিনটি চিত্রেই ক থেকে খ মানোন্নয়ন এবং ক থেকে গ গণচেতনার বিস্তার সূচিত করছে। খ এবং গ বিন্দু যত এগুবে পরস্পরের দূরত্ব বাড়বে। গণসংযোগ-প্রত্যাশী শিল্পের হয় মানকে নামিয়ে আনতে হবে। ১নং চিত্রে কখ১, কখ২ অবস্থান ক্রমেই কখ থেকে সরে আসছে, কগ-এর কাছাকাছি হচ্ছে। গণসংযোগের এই একটি সম্ভাব্য পন্থা। দ্বিতীয় পন্থা হল গণচেতনাকে মানের দিকে টেনে নেওয়া। ২নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে কগ১, কগ২ অবস্থানগুলি ক্রমেই গণচেতনাকে উন্নত মানের দিকে টেনে নিতে চাইছে। ৩নং চিত্রে কখগ১ [কখগ২] এবং কখগ২ [কখগ১] দুটি ভিন্ন মাত্রায় মান ও গণ-চেতনার মাঝামাঝি থেকে আংশিক গণসংযোগ করছে। একটা না একটা রফা

করছেই। এখানে শেষ পর্যন্ত দুটি প্রশ্ন আমাদের তাড়া করবে। ১. জনপ্রিয়তা ও গণসংযোগ কি সমার্থক? ২. নক্সাগুলিতে আমি যে ক-বিন্দুর কল্পনা করেছি, যেখানে থেকে মানোন্নয়ন এবং গণসংযোগ ক্রমে বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হয়েছে, শিল্প ও সংযোগের সেই মিলনবিন্দু কি বাস্তব না নক্সা তৈরির সুবিধার জন্য ভেবে-নেওয়া?

প্রথম প্রশ্নের আলোচনা আপাতত মুলতুবি রইল। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার একটা মোটা মতো জবাব এখনই দিয়ে রাখতে চাই। ক-বিন্দুতে আছে মানুষের আদি শিল্প-প্রয়াস, যার ধারা আজও বহন করে চলেছে বিচিত্র লোকায়ত কলা।

● ২. দ্বীপ এবং অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র

এক সময়ে সাহিত্যে, শিল্পে জোরটা থাকত বস্তুতে। এমন কি যখন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য তীক্ষ্ণ ও অভ্রভেদী হয়ে উঠল তখনও শিল্পী-সাহিত্যিক নিজের স্বাতন্ত্র্যের গানকে সামাজিক মানুষের মনের আয়না করে তুলতেন। যেমন গীতিকবিতায়। নাটক-উপন্যাসের নরনারী ব্যক্তি লক্ষণে স্থিত হয়েও, মানব সাধারণের চিত্তের বার্তা বয়ে বেড়াত। তবুও বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত অহংয়ের রোমান্টিকতা আশ্রয়ী আত্মপ্রকাশের মধ্যেই। একটি উদ্ধৃতি: 'মনে পড়িতেছে কোনো ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি মনে হয়—এক কালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপের মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে'।[২]

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থেই লিখুন না, আত্মিক গহনতার যে দার্শনিক সুরই এখানে বাজুক, এর সামাজিক ভিত্তি খুঁড়লে পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বার্থের অর্থনীতির খোঁজ মিলবে। মানুষকে সামাজিক সংঘবদ্ধতা থেকে ছিঁড়ে ব্যক্তিত্বের গ্রহে গ্রহে নিক্ষেপ—এ কীর্তি ধনবানের, এই বোধ আসলে শ্রেণী চেতনাই।

তবুও রোমান্টিকদের স্বপ্ন প্রেম, প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সংযোগ বন্ধন অসহিষ্ণু বিদ্রোহী কামনা এবং বিশ্বব্যাপারে বর্ণাঢ্য ও বিস্মিত আগ্রহ ছিল। এও বুর্জোয়া ধ্যানের এক ধরনের আভ্যন্তর দ্বন্দ্বই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমে যার সূচনা তা এক বিমূঢ় একাকীত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে পৃথিবী জুড়ে সে ব্যাপার সর্বব্যাপী হয়ে উঠল, শিল্পে-সাহিত্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কাফ্‌কার বিচার থেকে কাম্যুর পতন। অস্তিত্ববাদী দর্শন আর বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব। সমাজতন্ত্রের নব্য সাধনা মানবিক

সংযোগের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যখন বাস্তব করে তুলতে চাইছিল পৃথিবীর এক প্রান্তে তখনই তার প্রতিবাদ ব্যক্তিমুক্তির তথা ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার মন্ত্রোচ্চারণে। এটাই আধুনিক পৃথিবীর ডায়লেক্‌টিক্স। এদেশেও সেই ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা রমণীয় কবিত্বে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি এক হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে…
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন
আমার মনের মতো নাকি?
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।[৩]

বাংলা কবিতার একটা বড় অংশ নানাভাবে স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, স্বাতন্ত্র্য-বিলাসী। ভাষার অসাধারণ বক্রতায় ব্যক্তিচিহ্নে তার চারধারের সীমারেখা সংকুচিত হয়ে আসছে প্রতিদিন। তবুও এঁদের অনেককে আন্তরিক বলে মনে হয়। তাঁদের অনুভূতি কিছুটা সময়ের শেষকাটের ফ্যাসান হলেও, অনেকটা ভেতরের। কিন্তু সাহিত্যের সাধারণ পাঠকের কবিতাভীতি ঘুচল না। কবিতাপাঠের আসর বসিয়ে ঘোচানো যায়নি সে অপরিচয়। যাঁরা জনগণের কথা লেখেন, তাঁদের ভাষা-ছবি বড় জোর একটা বুদ্ধিপ্রাণিত স্তরের জন্য। যে ভাষা সকলের, কবিরা তাকে করে তুলেছিল ব্যক্তিগত, কখনও বা গুহ্যাচারী মন্ত্রের মতো। তার মুখ সকলের দিকে ফেরানো গেল না।

বাংলা গল্পসাহিত্যের উঁচু মাপের লেখায় একসময়ে প্যাসিভ নায়কেরা বিচরণ করেছে, শশীর মতো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব[৪] আমাদের উপন্যাসের গর্ব বলে বিবেচিত হয়েছে। এত সত্যচরিত্র, তবুও কোন্ নক্ষত্রের অধিবাসী যেন। তারপরে কথা-সাহিত্যে এল বাণিজ্যিক পেশাদারি। বাড়তে লাগল তার পাঠকের সংখ্যা, বিক্রি, লাভের বাজার। সত্যবোধ ও আন্তরিকতাকে মূল্য হিসেবে দিতে হলো। আবার সেই পুরনো কথা—এই জনমুখিতা, অবশ্যই নিরক্ষর অগণিত মানুষ

থেকে অনেক দূর। এবং এই সংকীর্ণ সংযোগও শিল্পগুণের অবনমনেই লব্ধ। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের এই বিশিষ্টতা বুঝবার সুবিধা হবে বলে নিচের নক্সা।

(৭)

নক্সা—দুই
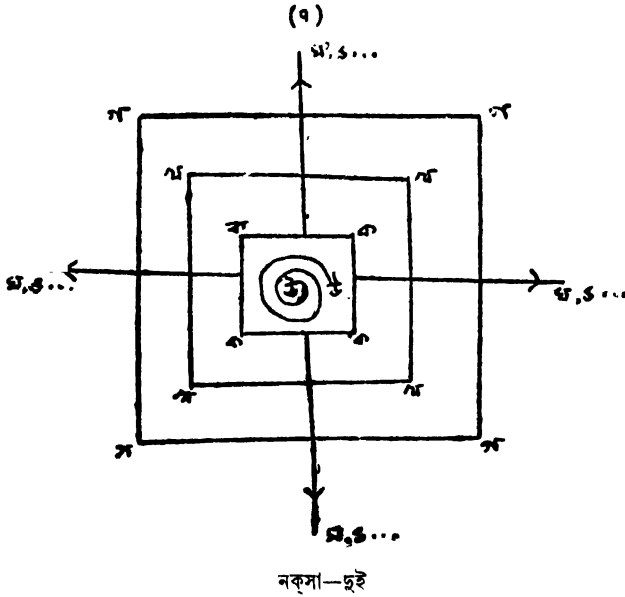
উঃ সাম্প্রতিক জনপ্রিয় বেস্টসেলার উপন্যাসের পাঠকবৃত্ত।

ক-সীমা : শিক্ষিত সাহিত্য-পাঠক সমাজ।

খ-সীমা, গ-সীমা } নানা স্তরের সাধারণ মানুষ—সাক্ষর এবং নিরক্ষর, সাহিত্য-পড়ুয়া নয়।

ঘ, ঙ…ঐ। সীমাহীন [তাই অচিহ্নিত বিস্তার]।

● ৩. ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ

ভাষা মানুষের, ভাষা যখন কথা। ভাষা যখন লেখা, তাতে মুষ্টিমেয়ের অধিকার—বিশেষ করে আমাদের দেশে। দেশের বেশিরভাগ নিরক্ষর—মাত্র সাক্ষর—অল্পশিক্ষিত—সাহিত্য-পাঠে সমর্থ খুবই সামান্য—এবং সাহিত্য-পাঠক নগণ্য। সেই নগণ্যকে হিসেবে রেখে জনপ্রিয়তা এবং বাণিজ্য। এখানে যাঁরা সফল সাহিত্যিক তাঁদের সঙ্গে গণমানসের সম্বন্ধ নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বাংলায় অধিকাংশের কাছে নামেও অপরিচিত। বহু উৎসব এবং পথযাত্রায় তাঁকে সত্য অস্তিত্ব করে তোলা যায় না।

সাহিত্যের তুলনায় অন্য পারফরমিং আর্টের। সে ভাষাসর্বস্ব নয়, ভাষার অধীন নয়—কখনও ভাষা-নিরপেক্ষ। ভাষাকে যখন যতটুকু আশ্রয় করা হয় তা বলার—শোনার, লেখার—পড়ার নয়। সেখানেও গণসংযোগে বিবিধ বাধা, কোথাও বা দুস্তর—যখন তা শ্রেণীগত। অর্থনৈতিক শ্রেণী অবস্থান থেকে রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরভেদে, বেস-সুপারস্ট্রাকচারের নানামাত্রার মিশ্রণে তা জটিল। অভিজাত ও লৌকিক—এইভাবে ভাগ করে বললে এদের চেনা সহজ হবে।

যতটা মনে হয় প্রাচীন ভারতের অতিসমৃদ্ধ নাট্যকলার সঙ্গে জনসাধারণের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। তারা অনধিকারী এবং দূরবর্তী ছিল।[৫] এবং দূর থেকে তারা নিজেদের মতো নানা জাতের লোকায়ত নাট্যরীতি গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহদের আনুকূল্যে বিকশিত রাগসংগীতের সঙ্গে জনগণের আত্মিক সংযোগ কোনোকালেই ঘটেনি। অঞ্চলে অঞ্চলে নিজধারায় বিচিত্র লোকগীতের প্রচলন হয়েছিল। কচিৎ কীর্তনের মতো গানের মাধ্যমে রাগসংগীত গণনৈকট্য লাভ করতে পেরেছিল। সংযোগের দিক থেকে এরূপ নিদর্শন খুব সুলভ নয়।

পারফরমিং আর্টের মধ্যে থিয়েটার জাতীয় অনুষ্ঠান এবং নৃত্যের সংযোগ-ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি। কারণ এরা একই সঙ্গে শ্রবণদর্শনের অভিমুখি। এদের মধ্যে দৃশ্যময়তা এতই প্রবল যে এরা ভাষার সীমা ডিঙিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে।

ইংরেজ আমলে বাংলায় যে নতুন থিয়েটার তৈরি হল তা ওদেরই অনুকরণে। দেশীয় পুরনো নাট্যরীতির দিকে তা চোখ ফেরাতে চায় নি। ফলে গণসংযোগের সম্ভাব্য সেতুটি আগেভাগে ভেঙে রেখেছিল। কলকাতা মহানগরী তার কেন্দ্র, বৃহৎ দেশে তা ছড়িয়ে নেই। কিন্তু তবুও এই কলকাতা সহরেই সেই বিজাতীয় অনুষ্ঠান সাহিত্য-পাঠকদের তুলনায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংগে সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কি ক্ষুদ্র সে বৃহত্ব।

বড় মফস্বল সহরে, বর্ধিষ্ণু গ্রামে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের চেষ্টায়, কোথাও ধনবান বা ভূস্বামীদের আনুকূল্যে, কলকাতার বাঁধা রংগমঞ্চের আদলে শৌখিন থিয়েটার গড়ে উঠত। তার চারধারে জনমণ্ডলীর একটা স্তর—প্রধানত অল্পাধিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভিড়। গণসংযোগের-দিকে এরা এর চেয়ে বড় কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি। অন্য দিকে থিয়েট্রিকাল যাত্রার একটা নতুন ধারা তৈরি হয়ে

উঠেছিল। এর ভিত্তিতে গণসংযোগের ইচ্ছা কাজ করে থাকবে। কিংবা শুধুই ব্যবসায়িক বোধ থেকে এই ইচ্ছার জন্ম।

লোকায়ত অভিনয় কলার কিছু কিছু অংশ বাণিজ্যিক নব্য মঞ্চরীতির সঙ্গে মিশিয়ে এই যাত্রা তৈরি হয়েছিল। পুরানো এবং গ্রামীণ মানুষের মধ্যে বহু-প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য—'থিয়েট্রিকাল যাত্রা' নামকরণ কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এর সম্বন্ধের দিকটা ঠিকমতো বুঝিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু লোকপ্রচলিত যাত্রারীতি থেকে খোলা আসর, পট-পর্দা বর্জন, গানের বাহুল্য, পৌরাণিক ভক্তিরস[৬] ও বিবেক জাতীয় চরিত্রের সংযোজন ঘটানো হয়েছিল। মোটামুটি সিদ্ধান্ত হল: বাণিজ্যিক থিয়েটার+পুরনো যাত্রা=থিয়েট্রিকাল যাত্রা।

কিন্তু আরও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হবে, পুরনো যাত্রার উপাদান আমদানি করে কলকাতার নাট্যাভিনয়কে আরও স্থূলতায় বদলে নিয়ে ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছল এই থিয়েট্রিকাল যাত্রা। এখানে সংযোজনের প্রধান উদ্দেশ্যটা ছিল ব্যবসায়িক নতুন বিস্তৃত বাজার দখলের অভিযান। এই সূত্রে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলে রাখছি—ব্যবসায়িক লক্ষ্যে যে সংযোগ তা কি যথার্থ সংযোগ?

আবার ভাষা সমস্যায় ফিরে আসা যাক।

থিয়েটার—গ্রামীণ-শহুরে—ব্যবসায়িক, শৌখিন, রিচুয়ালিস্টিক, আর্টিস্টিক স্বতঃস্ফূর্ত বা প্রথাগত, যাই হোক না ভাষাকে কিন্তু এড়িয়ে যায় না, যদিও ভাষাকে সর্বস্ব এমন কি প্রধান মাধ্যম করেও রাখে না।[৭] তারা বর্জন না করলেও 'পড়া'র সীমা ছাড়িয়ে 'শোনা'য় ছড়িয়ে দেয়, আভিনয়িক প্রকাশ শোনার ভাষার আবেদন বাড়ায়। প্রত্যক্ষ ঘটনা ও ক্রিয়া, সাজসজ্জা, অঙ্গভঙ্গী নিয়ে থিয়েটার-জাতীয় অনুষ্ঠান সংযোগের দিকে ভাষা-সর্বস্ব সাহিত্যকে ডিঙিয়ে যায়। শুধু শিক্ষার বাধা ভাঙার জন্যেই নয়, শিক্ষিত স্তরকেও আরও প্রবলভাবে টানবার ক্ষমতা রাখে বলেই।

ভাষার সংযোগ-ক্ষমতা যে কত শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যমুখী—সে কথা সকলের জানা। মোটা প্রয়োজন থেকে সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতি পর্যন্ত সর্বত্র তার যাতায়াত। ভাষা যখন লিখিত সাহিত্য তখন আরও বেশি করে এইসব সূক্ষ্মতা, জটিলতা প্রকাশ পায়। রঙে-গন্ধে-স্পর্শে তার ইন্দ্রিয়ভেদী আবেদন। মুখের ভাষা এতখানি শক্তিধর নয়, কিন্তু স্বভাবত অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অকৃত্রিম। তার মধ্যে বক্তাশ্রোতার যোগাযোগ কায়িক-বাচিক ভাবের, আবেগের প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথ

থেকে বিচক্ষণ ভাবনার একটু উদ্ধৃতি : 'ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরও একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।...

'কারণ প্রকৃতিতে যাহা দেখি তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায় তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।..

প্রকৃত রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে তাহার বেদনা আকারে ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না'।[৮]

লেখার ভাষা জলজ্যান্ত জীবনের ভাষার কাছে প্রতিক্ষণ ঋণী। এই কারণেই মুখের ভাষার ভিত্তিতে তৈরি সাহিত্য লিখিত সাহিত্যের পরিমার্জিত জটিলতা যদি বা হারায়, সহজে অনেক মানুষের কাছের বস্তু হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আর দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে সমস্যাটির অন্য একটা দিকে তাকানো যাক :

১. [একটি বোবা মেয়ের কথা বলতে গিয়ে] : 'কথায় আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো, সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপর ছায়া ফেলে ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়, কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে।'[৯]

২. 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধচারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানুষের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।...
প্রভাতের শুভ্রভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তেকে করি উদ্ঘাটন
নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার ;

যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে সমস্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্বখেদ সকল প্রয়াস,
জীবলোক মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস'।[১০]

উদ্ধৃতি দুটি শুধু একটা বক্তব্য বলেনি, রচনা-কৌশলে প্রমাণ করেছে, মৌনের যে আবেদন বিশ্বনিখিলে এবং স্বভাব বা পরিস্থিতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো মানুষে, তাকে উঁচু মাপের কবিশিল্পীরা, যেমন রবীন্দ্রনাথ, ভাষায় তর্জমা করে নিতে পারেন।—যদিও তা পৌঁছবে মুষ্টিমেয় ভাষারসিক ভাবুক মনের কাছে। নিসর্গ ও মানুষের মৌনকে ভাষার দ্বারস্থ না করে, নৃত্যের ভঙ্গীতে [কোথাও ভাষাগীতির কোথাও শুধু যন্ত্রসংগীতের সহযোগে', নীরব ক্রিয়াকলাপে, মূকাভিনয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা হতেই পারে। সকলেই জানেন যে বিবিধ পারফরমেন্সের মাঝে মাঝে ভাষাহীন অংশ কিছু থাকে, তারা কিন্তু মোটেই আবেদনহীন নয়। তাছাড়া অন্য অনেক দেশের মতো এখানেও এমন পারফর-মেন্স ছিল বা আছে যা পুরোপুরি ভাষাহীন কিংবা ভাষা যেখানে গুরুত্বহীন। এদেশের সাম্প্রতিক মূকাভিনয় দেহভঙ্গীতে ভাষাধৃত রচনাদিকে মাথায় রেখে তারই এক ধরনের তর্জমামাত্র, এবং সে কারণেই সীমাবদ্ধ। যেখানে তা স্বাধীন হয়ে উঠতে পেরেছে সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু করেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমে লিভিং থিয়েটারের একটা ধারণা এসেছে। তাতে দেহের ভাষাকে প্রাণীজগতের আদিম ও সর্বজনীন ভাষা বলে মনে করা হচ্ছে, যা নাকি দেশে দেশে তো বটেই, সময়ের যে দূরত্ব তাতেও, সেতু বাঁধতে পারে।[১১] এই দর্শন থেকে ফিজিক্যাল অ্যাকটিং-এর বোধ দানা বেঁধে উঠেছে। এই পরীক্ষা সাংস্কৃতিক গণসংযোগের ক্ষেত্রে একটা বড় দরজা খুলে দিতে পারে।

● ৪. দৌড়, প্রযুক্তির পেছনে

টেলিভিশনকে যত গণ্ডমূর্খের কাণ্ডকারখানা[১২] বলে যাঁরা ব্যঙ্গ-হাস্য করেছিলেন, আজ সে হাসি লুকোবার জায়গা মেলে না। এই টেলিভিশনের কথায় পরে আসব। একটু পেছন থেকে শুরু করা যাক।

প্রথমে গ্রামোফোনের কথা। অনেকটা বই কিনে সাহিত্যপাঠের মতো, রেকর্ড কিনে গান শোনা। নিজের খুশিতে পছন্দে। আসর থেকে, সহর-কেন্দ্র থেকে, এর ফলে গানকে নিয়ে আসা গেল দূর মফস্বলে, নিজের ঘরের কাছাকাছি।

পঙ্কজ মল্লিক-কমলা ঝরিয়ারা, রবীন্দ্র-নজরুলগীতি অনেক মানুষের সঙ্গে সমযোজিত হতে থাকে। গায়কের ব্যক্তিগত উপস্থিতি থেকে গানকে বিচ্ছিন্ন করে উপভোগ—স্থানের দূরত্ব ডিঙিয়ে যাওয়া, সময়ের বাধাও। মুদ্রণ ও প্রকাশনা যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল সাহিত্য-সংযোগের ক্ষেত্রে অনেককাল আগে, সেই বিপ্লব গ্রামোফোন আনল গানের জগতে। যন্ত্র—আরও উন্নত যন্ত্রের পেছনে চলল সাংস্কৃতিক সংযোগ। আর এসব যান্ত্রিক ব্যবহারই বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ে নিয়ন্ত্রিত।

নগর কেন্দ্রের সংগীত সংস্কৃতিকে জনমণ্ডলীর [তারও সীমা সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘকাল ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আশ্রয়ী পরিধির সঙ্গে সংযোগ সাধনে গ্রামোফোন গুরুতর ভূমিকা নিয়েছিল। প্রযুক্তির ক্রমিক উন্নয়নে ক্যাসেটে প্লেয়ারে তার বিবর্তন—তাতে কিন্তু সংযোগে কোনো নতুন মাত্রা আসেনি। একথা ঠিক, যান্ত্রিক উপাদানগুলি সহজলভ্য হয়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে বলে আনুপাতিক ব্যবহারও বেড়েছে মধ্যবিত্ত থেকে অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত নিম্নবিত্তের একটা অংশ পর্যন্ত প্রভাববৃত্ত প্রসারিত হয়েছে, গ্রামের কাছে, শ্রমিক বস্তিতে রেকর্ড-ক্যাসেট বাহিত গান ঢুকে পড়েছে।[১৩] কিন্তু এর ফলে জনমণ্ডলীর এই নতুন স্তরগুলিতে একটা বাইরের প্রভাবের বেশি কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। এমন নয় যে ক্যাসেট-বিপ্লব সংগীত-সংস্কৃতির মহানাগরিক তথা স্টার-পদ্ধতির ছোটগণ্ডী ভেঙেছে, নব নব অনেক কেন্দ্র গড়ে তুলতে পেরেছে, কিংবা কেন্দ্রটি ক্রমপ্রসারিত হয়ে পরিধির কাছে এসে পৌঁছেছে। রেকর্ডে ক্যাসেটে নাটকাদির প্রচারও কিছু কম হয়নি। কিন্তু আজও রেকর্ডনাট্য, শ্রুতি-নাটকাদির বিশিষ্ট ধর্ম আয়ত্ত করে একটা বিশিষ্ট আর্ট-ফর্ম হয়ে ওঠেনি। এর আবেদন সংযোগের দিক থেকে কোনো উল্লেখ্য বিষয় নয়।

সিনেমা এবং রেডিও বৈপ্লবিক শক্তি নিয়ে দেখা দিলেও বহুকাল পর্যন্ত তারা ছিল বাধাগ্রস্ত, স্খলিতগতি। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বেতারের প্রসার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যুৎ কিছু সংখ্যক জেলাসহর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এবং রেডিও ছিল পুরোপুরি বিদ্যুৎ-নির্ভর। ৪৫-৪৬ সালে মহকুমা সহরে মোটর-ব্যাটারি চালিত রেডিও সেটের সামনে যুদ্ধ ও দাঙ্গার তাজা খবর শুনবার জন্ম ভদ্রলোকদের ভিড় ও আগ্রহ আমার নিজের অভিজ্ঞতা। দুর্বোধ্যপ্রায় শব্দ মাধ্যমে কিছু প্রয়োজনীয় খবর শুনে তাঁদের কৃতার্থ হতে দেখেছি। সহরের কেউ কলকাতায় রেডিওর গান গেয়ে এলে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠতেন।

সিনেমার বেলায় একই ব্যাপার। ওটা মূলত কলকাতার সম্পত্তি, জেলা সহরে দু-একটি স্থায়ী হল তৈরি হয়েছিল। মহাকুমা এবং বড় গঞ্জে ডায়নামো চালিয়ে এক দেড় মাস সিনেমা আমদানি হত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে—কলকাতার পাবলিক থিয়েটার-দল বা যাত্রাপার্টির সাময়িক ভ্রমণের মতো সেই আয়োজন। আর একটা প্রমোদ, অনেক চমকপ্রদ। ছবিতে মানুষেরা নাচছে গাইছে, কথা বলছে, পাহাড় জংগল সমুদ্র সামনে। বিস্ময় ও উত্তেজনাই প্রধান, অপরিচয়ের দূরত্ব যার ভিত্তি। এ-সব নেহাত সাময়িক যোগাযোগ [ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্ট] সাংস্কৃতিক সংযোগ নয়।[১৪]

স্বাধীনতার পর থেকে এই দুই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক মাধ্যমের ক্রমিক বিকাশের ফলে সংস্কৃতি সংযোগে বিবর্তমান তাৎপর্য কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

স্বাধীনতার পর থেকে রেডিওর ব্যবহার, কেন্দ্রগুলির সংখ্যা এবং সম্প্রচার ক্ষমতা ক্রমে বাড়তে থাকে। বিদ্যুতের সুযোগ ছোট সহর এবং গঞ্জগুলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ায় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছেও একটি বেতারগ্রাহক যন্ত্র অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তারপরে ছয়ের দশক শুরু হলে ট্র্যানজিস্টার-প্রযুক্তি রেডিওর ক্ষেত্রে এক বিশেষ পরিবর্তন আনে। আজ গ্রামের সম্পন্ন কৃষক এবং মাঝারি দোকান-দারের কাছে এটি একটি প্রয়োজনীয় বস্তু।

সরকারি ব্যবস্থাপনা বলে রেডিও মুনাফামুখী প্রতিষ্ঠান নয়। তাই রেডিও-শিল্পীদের মধ্যে নাগরিক বক্সঅফিস স্টারদের একচেটিয়া প্রাধান্য নেই। অনেক শিল্পী একেবারে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে আসছে, যাদের কেউ পেশাদার নয়। পারফর্মার-অডিয়েন্সে, বিস্ময়-বিহ্বল দূরত্ব না-থাকা সংযোগের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু গানের কথায় সুরে পেশাদার-অপেশাদারে পার্থক্য নেই, একই সাংস্কৃতিক রুচির দিকে এদের দুদল-এর লক্ষ্য। কাজেই সংযোগের সেই সম্ভাবনা আর কার্যকর হয়ে উঠেনি। কখনও কখনও মফস্বল বা গ্রামীণ অনুষ্ঠান তার নিজস্ব চরিত্র নিয়ে রেডিওতে আমন্ত্রিত হয় বটে, তবে সেই অতি সীমিত আবেদন কোনো উল্লেখ্য ভূমিকা নিতে পারে না। এই বিরাট দেশে সাংস্কৃতিক স্তরের ও শিক্ষামানের বৈষম্যের মধ্যে যদি অঞ্চলে অঞ্চলে ছোট পরিধিতে বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হত, তাকে নাগরিক জলসার রিলে সেন্টারে পরিণত না করা হত, স্থানিক সংগীত শিল্পীদের সহযোগে একটি সুস্থ সংযোগ-বিধি গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা হয়নি, মূলত সহরের গান প্রভৃতি শুনবার

যন্ত্র হয়েই থাকল রেডিও।

উপরন্তু এই সরকারি প্রতিষ্ঠানও অংশত ব্যবসায়ীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কার্যক্রমে হিন্দি ফিল্মিগানের ব্যাপক আয়োজন থাকছে। তাতে সাময়িক মুগ্ধতা আসতে পারে, সংযোগ ঘটে না।

কোথাও কোথাও যেমন কলকাতায়, বেতারনাট্য আজকাল একটি শ্রুতি নির্ভর শিল্পরূপ হয়ে উঠতে পেরেছে। একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে শিল্পগত সংযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন প্রাপ্তি। কিন্তু ব্যাপকভাবে কার্যকর টেলিভিশন আমাদের মধ্যে দাপটে প্রবেশ করেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর দেশে সিনেমা শিল্পের, ব্যবসা এবং কলা দুই অর্থেই—ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিরাট পুঁজির ব্যবসা হিসেবে যেমন সিনেমা আজ একটা বড় সমাজ-সত্য, আবার অনেক উঁচু দরের ছবি তৈরি হবার ফলে কলা হিসেবেও এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠা। জনসাধারণের কাছে সিনেমা এক পরম আকর্ষণীয় প্রমোদ। গ্রামোফোন রেডিওর চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সেখানে শুধুই শব্দের আয়োজন—সিনেমায় শব্দ ও দৃশ্যের সমন্বয়। দৃশ্যময়তা বহুমাত্রিক এবং সর্ব-গ্রাসী। কতক নাট্যাভিনয়ের মতো, যদিও থিয়েটারে জীবন্ত নরনারী আর এখানে শুধুই ছায়াছবি—কিন্তু বাস্তব জীবনের বিভ্রম ঘটাতে কোনও ফাঁক নেই। বরং বাড়তি আছে, বিশ্বজোড়া যে নয়নরঞ্জন আয়োজন তার সংযোজন। এসব কারণে সিনেমার প্রবল আকর্ষণ, জনমনে প্রভাব বিস্তারে প্রচণ্ড ক্ষমতা। স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে সিনেমা হলের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলেও সুদূর পল্লীর লোককেও টানছে। তবে তাদের দেখাশুনো এখনও অল্পই। সহর-সহরতলীর বস্তিবাসী গরিব মানুষের উপরে এর গভীর ছায়া পড়ছে। বালকের চিত্তগঠনে, অপরিণত মনকে প্ররোচিত ও মোহগ্রস্ত করতে, বয়স্ককে আগ্রহী, সানন্দ বা বিরক্ত-বিমুখ করতে সিনেমা কাজ করে চলেছে। এটা বড় মাপের ব্যবসা, বিরাট পুঁজির ঝুঁকি এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল ধরনের সেন্সরে সীমাবদ্ধ—প্রধানত এই তিনটি কারণে বেশিরভাগ ছবি সস্তা চটকদার, অলীক কল্পনার আশ্রয় এবং ফর্মুলা ধরে তৈরি। তারা বিশ্বাস জাগায় না, স্বপ্নও দেখায় না, নেশাগ্রস্ত করে, চোখে কানে তাৎক্ষণিক মোহ আনে, বিচারকে ঘুম পাড়ায়। সংযোগে তাদের ভূমিকা তাই প্রত্যাশার কাছেও পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া সিনেমা কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রকে আশ্রয় করে, সে-সব কেন্দ্রে শিল্পী-কারিগর-পরিচালক-দের নিয়ে এমন পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে যার চারপাশে রহস্যের বর্ণাঢ্য পর্দা যা টানে

কিন্তু কাছে আসতে দেয় না। বড় কারখানায় তৈরি এই পণ্য বাজারে ছাড়া হয়। বিকল্প মাল নেই। তাই কিনে খুশি হতে হবে।

আর একটা সমস্যা ভাষার বাধা। যেমন নাকি উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে হিন্দি ছবির সবচেয়ে বড় বাজার। কিন্তু এই বিপুল দেশখণ্ডের অনেক দর্শকই এ ভাষা বোঝে না, দেখে শুধু ছবি আর সুরের জন্য। প্রায়ই তা নির্বোধ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ওপরে ওঠে না।

এই পরিস্থিতিতে, সিনেমা একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী গণমাধ্যম হলেও, তার প্রভাবপ্রতিপত্তি অপরিসীম হলেও, সংযোগ যদিবা কখনও কিছুটা ঘটেও, তা আন্তরিক হয়ে ওঠার সুযোগ পায় না।

এবারে, এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম, টেলিভিশন। সাম্প্রতিক সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি-বিস্তার বিস্ফোরণে, মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ যোগাযোগের ক্রমোন্নয়নে টেলিভিশনকে অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাকে আরও কতদূর এগিয়ে দেবে তার কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছে। এর সঙ্গে যদি যুক্ত করি ভিসিপি-ভিডিও ক্যাসেট ব্যবহার-ব্যবস্থা, তো মানতেই হবে গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমার যোগফল আরও বহুগুণিত হয়েছে এর শক্তির মধ্যে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশেও এই সব কিছুর ফল ফলতে শুরু করে দিয়েছে।

অবশ্য একচেটিয়া সরকারি নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এর অনেকটা ক্ষমতা শুষে নিতে চাইছে। ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দি চাপানোয় অন্য ভাষাভাষী দর্শক-শ্রোতার একটা বড় অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ব্যাহত হচ্ছে। এই বিশাল দেশে আঞ্চলিক সম্প্রচারকে পুরোপুরি দিল্লির পরাধীন করে রাখায় বিচিত্র সংস্কৃতির পরিবেশন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। অতিমাত্রায় কেন্দ্রানুগত্য সারা দেশকে একই ধরনের কার্যক্রমে বেঁধে রাখছে।

টি. ভি.-তে সরকারি নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব—এই সব বিতর্কে আমার বর্তমানে ঢোকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গণসংযোগের দৃষ্টি-কোণে টি. ভি.-তে দিল্লির সর্বময় কর্তৃত্ব যে-সব জটিল সমস্যা এর মধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে, এবং ক্রমে যা আরও বেড়ে যাবে, তার উল্লেখ করলাম।

বিজ্ঞাপন দাতাদের কার্যক্রমও কিন্তু টি. ভি.-র এই চরিত্রে কোনো বদল ঘটাচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের অর্থ সরাসরি সরকারি দখলিস্বত্বকে যৌথ উদ্যোগে রূপান্তরিত করছে না।

পশ্চিমের মতো ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিযোগিতায় টি. ভি.-র বহু চ্যানেল খুলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা এক কথায় তার উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রতিযোগিতা কার্যক্রম বৈচিত্র্য আনবে এবং মানোন্নয়নে সহায়ক হবে, তাছাড়া বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেও নানা অঞ্চলে প্রবেশের দরজা খুলে দেবে। আবার মুনাফার লড়াই এবং কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর হাত থেকে বাঁধা খাদ্যের বরাদ্দ বিকৃতিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

অন্তত এ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য—সব কথা ভেবে চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরণের দিকে গেলেই গণসংযোগে টি. ভি. তার যথার্থ ভূমিকা পালনের উপযোগী হবে।

গ্রামীণ অনুষ্ঠান গ্রাম থেকে গ্রামে এবং সহরে মানুষের কাছেও নিয়ে যাওয়া, সহুরে সংস্কৃতিকে রেডিও সিনেমা নাট্যাভিনয়ের তুলনায় অনেক ভালোভাবে গ্রামে নিয়ে আসায়, এবং এই প্রক্রিয়াকে নিয়মিত করে তোলায়, সমযোজনের যে সম্ভাবনা টি. ভি. সৃষ্টি করেছে তার পুরো সদ্ব্যবহার অবশ্য এখনও অনেক দূরে।

মনে রাখা দরকার, এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচেকার মানুষের কাছে গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি সেণ্টারে টি. ভি. পৌঁছে দেবার কোনো প্রকল্প রচিত বা কার্যকর হয়নি। সে রকম কিছু ঘটলে এ দেশের সংস্কৃতি-সংযোগে টি. ভি.-র ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত। এবং উপরে যে সব সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছি তার কোনো কোনো দিক ভবিষ্যতে সত্য হয়ে উঠতেই পারে।

আলোচিত সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে বলা যায় সম্প্রতি মধ্যবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ সহর আধাসহরবাসী মানুষের কাছে টি. ভি. নিয়মিত দেখার বিষয় হয়েছে এবং সংস্কৃতি প্রচারের যতটা আয়োজন করা হচ্ছে তাতে এই সব স্তরের সঙ্গে সংযোগ প্রবাহ গাঢ় হয়ে উঠছে।

টি. ভি-র পরিবেশনে প্রচলিত আর্টফর্মের আনুগত্য এখনও চলছে। বেশির-ভাগ, সিনেমা বা নাট্যাভিনয়ে, ছো-নাচ বা বাউল, রবীন্দ্র-নৃত্য বা গানের আসর নিজ নিজ জগতে যেমন তেমনি ধরা হচ্ছে ছোট পর্দায়। এখনও টি. ভি. প্রায় একটি মাধ্যম মাত্র। তবে উল্লিখিত প্রতিটি পারফরমিং আর্ট এই মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে রূপে আবেদনে বদলে যেতে পারে, বদলে যাবেই। তখন সংযোগের দিকে কি ধরনের নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে তা এখনই অনুমান করে লাভ নেই।

● ৫. সংযোগের সর্বদা সন্ধান

যখন যেখানে বিচ্ছিন্নতা, সংযোগের চেষ্টাও সেখানে অবিরাম। কারণ একাকীত্ব শুধু দুঃসহই নয় মানুষের ধাতু-বিরোধী বলে অসম্ভবও। আমাদের দেশে বিচ্ছিন্নতা সামাজিক ব্যাধি হয়ে ওঠে উনবিংশ শতকে নব্য ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীগুলির পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। মনোজগতের বিপুল ঐশ্বর্য ও ঔজ্জ্বল্যের গভীরে যে অন্তর্লীন অভিশাপ এদের পীড়িত করেছে তার মধ্যে ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা ও দার্শনিকতার নানা উপাদান থাকলেও তা মূলত সমাজঘটিত একটি শ্রেণীসমস্যা, হয়ত কাছাকাছি অবস্থিত একাধিক শ্রেণীর যৌথ সমস্যা। এর আদি যুগের সচেতন নিদর্শন হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের কথাই প্রথমে মনে পড়বে। কমলাকান্ত বলেছেন :

'আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ তাড়িত জলবুদ্‌বুদ সমূহের মধ্যে আর একটা বুদ্‌বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণ গ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও'।[১৫]

কমলাকান্ত প্রীতির মধ্যে সংযোগ খুঁজেছিলেন অগণিত মানুষের সঙ্গে। জেনেছিলেন সংযোগে রোগের শান্তি। কিন্তু পবিত্র সদিচ্ছায় ইতিহাসের শাপমুক্তি ঘটে না। লেট দেয়ার বি লাইট—বললে উদ্ভাসিত আলোয় অন্ধকার মোছে না। এ নিয়ে আজীবন যিনি অনেক ভেবেছেন, তাঁর জীবনশেষের এই স্বীকারোক্তি :

> 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
> ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
> জীবনে জীবন যোগ করা
> না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা'।[১৬]

এই যোগ করার মন্ত্র রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি।

যত তীব্র লেখকের শিল্প-মানসের একাকীত্ব, তত গভীর ব্যাপক ও বিচিত্র তার সংযোগ-সাধনা। মানুষের ভাষার, বিবিধ সৃষ্টির মূল অভিপ্রায়ই হল অপরের কাছে পৌঁছাতে চাওয়া। আমার ভাবনা সকলের হোক, যা দেখেছি অন্যে দেখুক, আমার শোক-সুখ ক্রোধ আনন্দ সঞ্চারিত হোক সকলের মধ্যে। কত সোজা বাঁকা ভাঙাচোরা, ভাষা ছবি সুর—কোথাও স্পষ্ট উজ্জ্বল অথবা রহস্যঘেরা ইঙ্গিতময়—লক্ষ্য একটিই—অন্যের সঙ্গে চাই সংযোগ। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের সঙ্গে সৃষ্টির। আবার রবীন্দ্রভাবনার দ্বারস্থ হওয়া যাক :

'এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই—কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বাঁ-দিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে। কী ? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না ; তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিবে। আমার বাড়িঘর, আমার আসবাবপত্র, আমার শরীর মন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে—কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।'[১৭]

তত্ত্বামৃত প্রচারকেরা বাস্তব জীবনের উদাহরণ দেন, লোক-প্রচলিত গালগল্পের আশ্রয় নেন। সাধক কবিরা রূপকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি আঁকেন, যা শ্রোতার পরিচিত, চিত্তরঞ্জক। প্রাচীন বৌদ্ধ কবিদের কথা ভাবা যাক। তাঁরা ছবি এঁকেছেন, পাহাড়ের চূড়ায় খররবিস্নাত সদ্য শিকল-ছেঁড়া উল্লসিত হাতির, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ফুল-ভরা কাপাস খেতে মত্ত শবরীনৃত্যের। এগুলি তো তাঁদের তত্ত্বভাবুকতার লক্ষ্য ছিল না। এসব মায়া, আকাশকুসুমের মতো অলীক। তবু এই বাস্তব ছবির মধ্য দিয়ে বাস্তব মানুষের মনের পথ খুঁজতে হয়েছে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নাটকের মোচড় দিয়ে পাঠকের মনের দরজা খুলতে চান। রবীন্দ্রনাথ গল্প বলতে বলতে চিত্রশিল্পীর জন্য অপেক্ষা না করেই ছবির পরে ছবি আঁকেন। ভাষার সঙ্গে রেখার বিন্যাস জুড়তেই হবে।[১৮] গান গাইতে গাইতে বাউল দুপাক নেচে নেন। কারণ এঁরা সংযোগের নব নব সূত্র খোঁজেন। হয়ত অনেকের প্রত্যক্ষ ভাবনা পাঠক-দর্শক-শ্রোতার আজও মনোরঞ্জন, তাদের আরও

বেশি আকর্ষণ করা ; কারুর মনোভাব এমনটা না হলে আমার কথা ঠিকঠাক প্রকাশ করা গেল না। আসলে এ সবই হল সংযোগকারী প্রক্রিয়া।

সকলেই ভাবতে বুঝতে চান কাদের জন্য লিখি, আঁকি—কতদূর প্রসারিত হতে পারে সেই পরিধি, কতখানি ঘনিষ্ঠ করে তোলা সম্ভব। নিবিড়তা এবং বিস্তার সংযোগে এই দ্বিমুখী সাধনা শিল্পীর, এতে ব্যর্থতা বা সাফল্যেরও নানা মাত্রা। তারই একটি সরল সম্ভাব্য রূপ নিচের নক্সায় দেখাতে চাই :
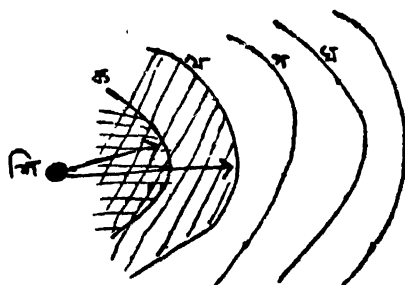
শি - শিল্পী। → - সংযোগের বিস্তার।
ক খ গ ঘ ... - জনমণ্ডলীর বিভিন্ন স্তর
▨ - সংযোগ। ▩ - নিবিড় সংযোগ।

নকশা—তিন

নক্সাটিকে আধুনিক কোনো শক্তিমান শিল্পীর সংযোগ প্রয়াসের মূল্যায়ন হিসেবে দেখা যায়। ব্যাপারটা অল্পাধিক প্রতিনিধিস্থানীয়। শিল্পীর সংযোগ ক—স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তিনি খ—স্তরে প্রসারিত হলেন নানা কৌশলে। কিন্তু জনসাধারণের বৃহত্তর পরিধিগুলো [গ, ঘ ইত্যাদি] তাঁর অনায়ত্ত থেকে যাবে। আরও দেখা যাবে যতটা তাঁর প্রসার তার সর্বস্তরে সংযোগের নিবিড়তা সমান নয়, হতেও পারে না।

শিল্পের রূপায়ণ সর্বদাই পাঠক-দর্শক-শ্রোতার অভিমুখী। সে দিক থেকে ভাবলে সংযোগের প্রাথমিক দায়িত্ব সব স্রষ্টাকেই পালন করতে হয়। বড় মাপের শিল্পকার স্পষ্ট জানেন, কোন স্তর পর্যন্ত তাঁর গতিবিধি, কোন স্তর পর্যন্ত যাবার চেষ্টা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ও সঙ্গত। কোথায় তাঁর প্রবেশ নিবিড় হতে পারে, কোথায় তা শুধুই ভাসমান। সব সময়ে সবাই তা জানতে বুঝতে পারেন না। কেউ কেউ কিন্তু জেনে বুঝে সংযোগের শিকড় ঢুকিয়ে দিতে চান গভীরে।

যাঁরা সমাজবাদে আন্তরিক বিশ্বাস রাখেন, এমন লেখকেরা অনেক সময়

কাদের হয়ে লিখছেন এবং কাদের জন্ম অর্থাৎ পড়বার জন্ম লিখছেন এ দুটো গুলিয়ে ফেলেন। মজুর-কৃষকের কথা তাদের দৃষ্টিকোণে লেখা হলেও ওরা তো পাঠক নয়—সামান্ত কিছু ব্যতিক্রম যদি থাকেও। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত পর্যন্ত ঘোরাফেরা করতে পারে এ-সব লেখা। সংযোগ ঘটাতে হবে তো এদের সঙ্গে। সেটা ভুলে যাওয়ায় এই সংযোগ ক্ষীণ হয়ে পড়ে, কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে সংযোগের সূত্র মেলে না।

অন্যদিকে ভাবা যাক মধুসূদন দত্তের কথা। সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবনা-চেতনা, সমকালীন ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালির মনে সঞ্চারিত করার জন্ম তিনি তাদের মনের গভীরে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত রাম-রাবণ কথার সিদ্ধ উপাদান নিয়ে কাজ করলেন—সম্পূর্ণ বিপরীত আবেদন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। পাঠকশ্রেণীগুলিকে চিনে নিবিড় সংযোগের এ-এক সচেতন অভিপ্রায়।

আরও ষাট বছর পরে শরৎচন্দ্র সম্ভাব্য পাঠক-সমাজের বৃদ্ধি খেয়ালে রেখে-ছিলেন। পড়তে সমর্থ অল্পশিক্ষিত পুরুষ এবং গৃহবন্দী নারীদের বিপুল ও ক্রম-বর্ধমান সংখ্যার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের যথার্থ ক্ষমতা বঙ্কিমের বর্ণাঢ্য কল্পনা বা রবীন্দ্রের অভিজাত রচনায় ততটা ছিল না। শরৎচন্দ্র এই মানুষদের বিষয়ে এদের ভাবাবেগ সহানুভূতি এবং বিদ্রোহবিমুখ গার্হস্থ্য দৃষ্টির সহযোগে পরিবেশন করলেন। একজন সচেতন সংযোগ-সৃষ্টিকারীর ভূমিকা পালন করলেন।

● ৬. জনপ্রিয়তা—সংযোগ—প্রভাব

কোন গল্প বা নাট্যাভিনয় কিংবা গানের জনপ্রিয়তা বুঝে নেবার স্পষ্ট মাপকাঠি আছে। কারণ এর সবগুলিই ভদ্রসমাজে ক্রয়যোগ্য পণ্য। কাজেই হিসেবপত্র পাওয়া কিছু শক্ত নয়। তুলনায় সংযোগের মাত্রা চিনতে কিছু ভেতরের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অনেক সময় ধরে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের আভাস ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এর খোঁজ করতে হয়। প্রভাবের ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী ব্যাখ্যায় জানায় প্রায়ই বাইরের প্রভাব আসলে প্রভাবই নয়, অনুকরণ বা বড়জোর অনুসরণ। যেখানে কোনো স্পষ্ট চিহ্ন নেই, সেখানেই হয়ত ব্যক্তি বা সমাজ-সত্তার গভীরে তার মশাল বহন করে। এই তিনটি বিষয় নিয়ে আপাতত বিচার্য হল :

১. জনপ্রিয়তার সঙ্গে সংযোগের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, থাকলে তা কি ধরনের।

২. জনপ্রিয়তা প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করে? আদৌ কিছু

করে কি ?

৩. সংযোগ এবং প্রভাব, একে অপরের সঙ্গে কতটা কিভাবে সংশ্লিষ্ট।

এই তিনটি বিষয়েরই নানা স্তর-উপস্তর। উপ-স্তরগুলি কম-বেশি-মাঝারি এমনি পরিমাণবাচক। তার মধ্যে না গিয়ে প্রধান স্তরগুলির কথাই বলি :

১. জনপ্রিয়তা	২. সংযোগ	৩. প্রভাব
১.১. সাধারণ	২.১. সাধারণ ও বহিরঙ্গ	৩.১. সাধারণ ও বহিরঙ্গ
১.২. ব্যাপক	২.২. ব্যাপক ও বহিরঙ্গ	৩.২. ব্যাপক ও বহিরঙ্গ
১.৩. স্থায়ী	২.৩. গভীর	৩.৩. গভীর
	২.৪. স্থায়ী	৩.৪. স্থায়ী

অবশ্যই স্থায়ী শব্দটিকে চূড়ান্ত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। আর গভীর জনপ্রিয়তা বলে কিছু হয় না।

প্রথমে জনপ্রিয়তা ও সংযোগের সম্পর্কে পরীক্ষা করা যাক :

× হয় না। √ হতে পারে। ● অবশ্য হবে। — অভাব।

১.১ → ২. × ; → ১.১ √ } বিকল্প অবস্থা।

১.২ → ২.১ ● ; → ২.২ √ } " –

১.৩ → ২.২ ● ; → ২.৩ √ } "

১.— → ২. √

১. সাধারণ স্তরের জনপ্রিয়তা সংযোগ সৃষ্টিতে পুরোই ব্যর্থ হতে পারে, অথবা সাধারণ মাত্রায় বহিরঙ্গ সংযোগ ঘটাতে পারে।

২. ব্যাপক জনপ্রিয়তার সঙ্গে সাধারণ ও বহিরঙ্গ সংযোগের অনিবার্য সম্পর্ক। ক্বচিৎ তা ব্যাপক বহিরঙ্গ সংযোগ ঘটাতে পারে।

৩. স্থায়ী জনপ্রিয়তা অবশ্যই ব্যাপক বহিরঙ্গ সংযোগ ঘটাবে, কখনও তা গভীর সংযোগ হতে পারে।

৪. জনপ্রিয়তা এতই কম যদি হয় যাকে সাধারণ স্তরেও ফেলা যায় না, যাকে

এক অর্থে বলা যায় জনপ্রিয়তার অভাব, সেক্ষেত্রেও সংযোগ ঘটতে পারে। যেমন, এখনকার পড়ুয়া সমাজে মানিকবাবুর চেয়ে শঙ্কর অনেক জনপ্রিয় কিন্তু জনপ্রিয়না হলেও পাঠকসমাজের চিত্তলোকে মানিকবাবুর উপন্যাস অনেক বেশি সমাযোজিত। বিভিন্ন ধরনের গ্রাম নাটক পল্লীর মুষ্টিমেয় মানুষের সমাবেশে অভিনীত হয়, গ্রাম্য কথকতা বা ভাসান গানও ছো নাচের মতো লোক টানতে পারে না। কিন্তু সংযোগ ক্ষমতায় তারা কিছুমাত্র ন্যূন নয়।

জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রভাবের সম্পর্ক কি? নিচে তার কিছু উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি।

১.১ |→ ৩. × } বিকল্প অবস্থা।
|→ ৩.১ √ }

১.২ |→ ৩.১ ● }
|→ ৩.১ √ } „

১.৩ |→ ৩.২ ● }
|→ ৩.৩ √ } „

১.— |→ ৩. √

১. সাধারণ স্তরের জনপ্রিয়তা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না, কচিৎ একাও বহিরঙ্গ ও প্রাথমিক প্রভাব ফেলে।
২. ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে সাধারণ বহিরঙ্গ প্রভাব না পড়ে পারে না। কখনও বা খুবই কম; বহিরঙ্গে কিন্তু ব্যাপক প্রভাবও পড়তে পারে।
৩. স্থায়ী জনপ্রিয়তা ব্যাপক বহিরঙ্গ প্রভাব তো ফেলবেই, গভীর প্রভাবও ছড়াতে পারে।
৪. জনপ্রিয়তা ছাড়াও প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে, তা খুব ব্যাপক হবে না কিন্তু গভীর হতে পারে।

জনপ্রিয়তার সঙ্গে সংযোগ ও প্রভাবের সম্পর্ক অনেকটা একধরনের। সংযোগ ও প্রভাব-এ দুয়ের সম্পর্ক সবটা নয় তবে অনেকখানি সমান্তরাল। প্রায়ই সংযোগ যেমন প্রভাবও তার আনুপাতিক।

২.১ ৩. × } বিকল্প অবস্থা।
৩.১ √ }

২.২ ৩.১ ● }
৩.২ √ }

২.৩ |→ ৩.৩ ●

২.৪ |→ ৩.৪ ●

২.— |→ ৩. –

অর্থাৎ,

১. সাধারণ ও বহিরঙ্গ সংযোগের ফলে কোনো প্রভাব সৃষ্টি না হতে পারে, আবার কখনও বা ব্যাপক ও বহিরঙ্গ প্রভাব বর্তায়।

২. ব্যাপক ও বহিরঙ্গ সংযোগের ফলে অবশ্যই সাধারণ ও বহিরঙ্গ প্রভাব বর্তাবে, কখনও বা ব্যাপক ও বহিরঙ্গ প্রভাবও বর্তায়।

৩. গভীর সংযোগের ফলে কিন্তু গভীর প্রভাব ঘটবে।

৪. স্থায়ী সংযোগের ফল স্থায়ী প্রভাব।

৫. সংযোগের অভাবে প্রভাব সৃষ্টি হয় না।

প্রায়ই সংযোগ ও প্রভাব সমান্তরাল, উপরের ৩, ৪, ৫ সূত্র দ্রষ্টব্য, অংশত ১, ২ সূত্রও। কিন্তু এরা এক নয়। এদের সম্পর্ক কার্যকারণের। সংযোগের ফলেই প্রভাব।

প্রস্তাব ঃ ২.

□ মাটির বুকে, শিকড়ে-গভীরে □

'আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি-চোখে চোখ ঘ'ষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।'　　'ঘাস' : জীবনানন্দ।

লোকায়ত পারফরমেন্সই আমার লক্ষ্য। সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝা যায়, তার এ-দিকটাই শুধু দেখব। নানা সূত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এ-জাতীয় অনুষ্ঠান করা হয়। যেমন :

১. বিনোদনে,
উদাহরণ : বহুরূপী, পুতুলনাচ।

২. লৌকিক ধর্মাচারে [রিচ্যুয়ালে],
উদাহরণ : মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া, রয়ানি গান।

৩. ভক্তিধর্ম প্রচারে,
উদাহরণ : পালাকীর্তন, কথকতা।

৪. সাধন-ভজনে,
উদাহরণ : বাউল, বোষ্টমের আখড়ায় একক বা যৌথ সংগীত।

৫. ভিক্ষা বা চাঁদাসংগ্রহে,
উদাহরণ : বারো বাঘের ছড়া কেটে বাস্তু পুজোর মাগুন আদায়, গান গেয়ে বৈরাগীর ভিক্ষা করা।

৬. শ্রমে-বিশ্রামে,
উদাহরণ : ছাদ পেটানোর ছড়া, নৌকা বাওয়ার গান, বটতলায় রাখাল-বালকের বাঁশি বাজানো।[১৭]

এদের প্রথমটি ছাড়া কোনো বর্গেই পারফরমেন্স প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য না হলেও, মুখ্য বা গৌণভাবে সব কটির মধ্যে তা থেকে যায়। এই যে নাচ-গান-আবৃত্তি

অভিনয়ের চর্চা তাদের কাউকেই গণসংযোগের জন্য চেষ্টা করতে হয় না, সাধারণ জীবনও উপভোগের সঙ্গে তারা ওতোপ্রোত। রীতিমতো আসর জাঁকিয়ে কথক ঠাকুর ভক্তিরস সঞ্চারিত করতে চায় শ্রোতাদের মনে। আবার নিজের মনে গান গেয়ে যায় পথচলতি বাউল, ভাটিয়ালির সুর তুলে মাঝি ভেসে চলে নৌকায়। শ্রোতারা তাদের লক্ষ্য নয়। তবুও জল-স্থলের যাত্রীদের, খেতঘাটের লোকদের শ্রবণ স্পর্শ করে যেতে যেতে মনের মধ্যে তা স্থান করে নেয়। কোথাও পরিবেশনে বিচিত্র কলা-কৌশল, কোথাও আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস। কিন্তু সংযোগের একই বিরামহীন প্রক্রিয়া।

এই পরিমণ্ডলে যাদের অবস্থান, যাদের জীবন-মন এর বিষয়, যারা এর শ্রোতা-দর্শক, যারা শিল্পী, তাদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ ও প্রত্যক্ষ। তারা এই যোগের বিশেষ তাৎপর্য বোঝে না, ভাবে না। কিন্তু তীরে দাঁড়িয়ে বলেই আমাদের গুরুতর প্রাপ্তি এই সংযোগ-প্রক্রিয়ার রহস্যভেদে।

● ১. কর্তা-কর্ম-নিমিত্ত

সহজভাবে দেখতে গেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তিন পক্ষ :

১. যারা অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ প্রযোজক-পরিচালক-অধিকারী, গায়ক-নর্তক-বাজিয়ে-অভিনেতা প্রমুখ।
২. অনুষ্ঠানের বিষয়, অর্থাৎ গল্প-গান-ভাব-প্রসঙ্গ প্রভৃতি।
৩. অনুষ্ঠান যারা দেখে-শোনে-ভোগ করে।

এই তিন পক্ষ অর্থাৎ অনুষ্ঠানের কর্তা-কর্ম-নিমিত্ত যারা তাদের মধ্যেকার সম্বন্ধের স্বরূপ ও মাত্রা এবং সম্পর্ক স্থাপনের বিবিধ উপায় তথা পদ্ধতির খোঁজ করা জরুরী।

অনুষ্ঠান যারা করে তারা অনেকেই গ্রামের পরিচিত লোক, কিংবা কাছাকাছি ভিন গাঁয়ের। তারা সাধারণত এর জন্য কোনো বিশেষ শিক্ষা বা সাধনা করেনি। অনেকে প্রথার বশে, সাময়িক হুজুগে, ধর্মগোষ্ঠীর নিয়মমাফিক, কিংবা রিচুয়ালের অঙ্গ হিসেবে গানে-নাচে যোগ দেয়। কেউ বংশ বা গুরুপরম্পরায় শিখে নেয়। কোথাও আবার দল বেঁধে মহলা দিয়ে তৈরি হয়ে নিতে হয়। অনেকেই পেশাদার পারফরমার নয়, গরিব চাষী, দিনমজুর অথবা বেকার যুবক। গৃহস্থ কন্যারাও আছে নানা রিচুয়ালে। আছে পেশাদার কবি-তরজা-পাঁচালির দল, ঝুমুর-নাচনি, যাত্রা [গ্রাম্য-কৃষ্ণযাত্রা] বা ছোনাচের পার্টি। এদের বায়না করে আনতে হয়। তবে প্রায়ই আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক অবস্থানের দিক

থেকে এঁরা সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র উঁচু স্তরের কোনো শিল্পী-মহল নয়।

এইসব অনুষ্ঠানে যে-সব বিষয় অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে থাকে মধ্যযুগের লিখিত নানাকাব্য-কাহিনী, লৌকিক লোকগাথা-লোকগীতি, বিবিধ পৌরাণিক বিষয়, বাস্তব জীবনের ঘটনা, লোকেদের যৌথবিশ্বাস-স্বপ্ন-স্মৃতি, রিচুয়াল ভিত্তিক ছড়া-নাচ ছবি প্রভৃতি। যুগযুগ ধরে গ্রামের জনগণের ভেতর থেকে এরা উঠে এসেছে অথবা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছে।

আসরে হাজির দর্শক-শ্রোতা, পথচলতি মানুষ, গৃহবাসী বধূ সকলেই এই সব অনুষ্ঠানের ভোক্তা। তৈরি-মঞ্চ ঘিরে, চণ্ডীমণ্ডপের সামনে, মেলায়-বারোয়ারি তলায় আসর বসে। গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে কোনো নোটিশ ছাড়াই অনুষ্ঠান স্বয়ং এসে হাজির হয়। গঞ্জে রাস্তার ধারে বসে, শোভাযাত্রার মতো পথ ধরে অনুষ্ঠান চলে যায়। দু-ধারে ভিড় করে দেখে শোনে নরনারী।

এভাবেই তিন পক্ষের সমঝোতা গড়ে উঠেছে বহুকাল ধরে—বাই দি পিপ্‌ল, অফ দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল। 'পিপ্‌ল'-এর জায়গায় 'ফোক' শব্দটি ব্যবহার করা চলে।

● ২. গভীর রাতের প্রহরী২০

পৌষ সংক্রান্তিতে বাস্তুপুজো হয় পুব বাংলার নিম্নাঞ্চলে। বাঘ-কুমিরের উপদ্রব থেকে বাস্তু এবং খেতিজমি রক্ষার জন্য পুজো। বোঝাই যায় বাদা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের ব্যাপার। মাটি দিয়ে বাঘ আর কুমির তৈরি হয়। ভূমিলক্ষ্মীর পুজোর পরে সেগুলির মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়।

বারোয়ারি বাস্তুপুজোর জন্য সারামাস জুড়ে গভীর রাতে যুবকের দল, বাড়ি বাড়ি ঘোরে, গান গায়:

আইলাম গো শরণে
লক্ষ্মীদেবীর বরণে
লক্ষ্মীদেবী দিউন বর
চাউল কড়ি বিস্তর।
চাউল না দিয়া দিবেন কড়ি
পাঁচ থাটালে সোনার লড়ি। —ইত্যাদি।[২১]

যুবকেরা চাল-আনাজ-টাকাপয়সা চাঁদা তোলে। বারোবাঘ নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে, ছড়া কাটে, বত্রিশ জোড়া পায়রা ওড়ার গান গায়।

নিম্নবঙ্গের বাদা অঞ্চলে, কাছাকাছি নানা স্থানে যুবকদের এই নৈশ অভিযান

প্রত্যক্ষত বারোয়ারি পুজোর মাঙনের জন্য হলেও, এর মধ্যে আছে বাস্তুখেতি রক্ষার জন্য বাঘ তাড়াবার লড়াইয়ের স্মৃতি। মালকোচা দিয়ে ধুতি পরে হাতের লাঠি ঠুকে লণ্ঠন উঁচিয়ে বাঘকে গালি[২২] দিয়ে ছড়া-কাটা-গান-গাওয়া একটা নকল যুদ্ধ-যুদ্ধের অভিযান। আধা সহরের শ্রোতা ছিলাম আমরা, পৌষমাসে কবে কোন্ রাতে এই দলের আবির্ভাব ঘটবে তারজন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আমাদের বালক মনে এই গান উত্তেজনা জাগাত। গ্রামের ভিতরে, বনাঞ্চলের সীমানায় এর আবেদন অনেক রূঢ় বাস্তব, অনেক সরাসরি। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে শ্রোতা গায়ক এক হয়ে যেত। বাড়ি বাড়ি ঘুরে এরা যেন পাহারা দিত, লোক জাগাত – তাদের তৈরি হতে বলত, জমি-জিরেত বাঁচাবার তাগিদে।

এই শতাব্দের চারের দশকে আমি যখন এ-সব গান শুনেছি, তখন সেই দেশে আর বাঘের উপদ্রব ছিল না। কিন্তু গানে-পুজোয় যুবকদের চাঁদা তোলার পদ্ধতিতে তবুও লালিত হয়েছে একটা অর্থনৈতিক-প্রাকৃতিক সংগ্রামের স্মৃতি।

মধ্যরাতে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির উঠোনে এরা গিয়ে হাজির হত, কয়েক মিনিটের জন্য তাকে গানের আসর বানিয়ে ফেলত। রুচিশীল অভিভাবক বাঘের গান গাইতে নিষেধ করত, কারণ এর মধ্যে কিছু প্রাপ্তবয়স্ক রসিকতা থাকত যা প্রায় শ্লীলতা-ডিঙানো। পায়রা-ওড়ার গান তার নিরীহ বিকল্প।[২৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আদিবাসীদের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে অবিবাহিত যুবকদের [কোথাও পৃথকভাবে যুবতীদেরও] রাত্রিবাসের সংঘগৃহ থাকে। এই যুবকেরা অনেক সময়ে গভীররাতে যৌথভাবে যৌনতাশ্রয়ী গান গেয়ে থাকে।[২৪] বাঘের গানে কোনোদিক থেকে তার প্রভাব পড়েছে কি না, কিংবা তার সাজাত্য আছে কিনা লোকসংস্কৃতির গবেষকেরা তা ভেবে দেখতে পারেন।

বাঘের গল্প বাংলা উপকথার একটা বড় উপাদান। বাঘ সেখানে এক বোকা হাস্যকর চরিত্র। যাকে ভয় তাকে ঠাট্টার বিষয় করে তুলবার 'ইচ্ছাপূরণ'—এ-জাতীয় লোককথার ভিত্তি, এরূপ মনে করা যেতে পারে। আলোচ্য বাঘের গান অনেকটা সমধর্মী আবেদন সৃষ্টি করে।

● ৩. লালন কি জাত সংসারে ?

দুই ধর্মের মৌলবাদীদের প্ররোচনায় সাময়িকভাবে পরস্পর বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়লেও, ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্য এবং জীবনাচারে সামান্য স্বাতন্ত্র্য থাকলেও সাধারণ বাঙালি,

বিশেষ করে গ্রামবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন এবং যোগাযোগের নানা প্রক্রিয়া অবিরাম কাজ করে চলেছে। এখানে দুটি নির্বাচিত প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

৩.১. গাজীর গান[২৫]

গাজীর গানের আগে 'মুস্কিল আসান' নিয়ে দু-এক কথা বলা যাক।

এক হাতে জ্বলন্ত ধুনুচি অন্যহাতে কালো চামর নিয়ে কালো টুপি—কালো আলখাল্লা পরে ফকির হাজির হয় গৃহস্থের প্রাঙ্গনে। হাঁক দেয়:

'মুস্কিল আসান করে দয়াল গুরুপীর'…

হিন্দু বাড়ির বধূও সন্তানাদিসহ পুরো বিশ্বাসে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। মন্ত্রের মতো আরবি-ফারসি-মিশ্র কিছু বাংলা শ্লোক বলে, মুস্কিল আসান অর্থাৎ বিপত্তারণ পীরের কীর্তিকাহিনীও আবৃত্তি করে। যাদুদণ্ডের মতো চামরখানি বুলিয়ে দেয় মাথায় গায়ে, নাকে লাগে ধুনোর গন্ধ। চাল-কড়ি দক্ষিণা নিয়ে পাশের বাড়ি চলে যায় ফকির। একে আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলছি না। পীরের কীর্তির গল্পও কোনো উপভোগে আসে না। কারণ গল্প এবং পরিবেশন-পদ্ধতি দুই-ই অতি মামুলী। আর গৃহস্থের সব আগ্রহ থাকে পীরের আশীর্বাদের দিকে। এখানে ঘনিষ্ঠ সংযোগ দুই ধর্মে—ভিন্ন বিশ্বাসে। শ্লোক পড়া যেন মন্ত্রোচ্চারণ, আন্দোলিত চামর যাদুদণ্ডের প্রতিরূপ। আদিম যাদু-বিশ্বাস জনগোষ্ঠীর অবচেতনে লালিত হয়ে ধর্মস্বাতন্ত্র্য ভেদ করে সংযোগের ভিত্তি হয়ে ওঠে। এই তাৎপর্য মনে রেখে গাজীর গানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত।

মুসলমান ফকির শ্রেণীর গায়ক, হাতে দণ্ড—নিচের দিকটা লোহা বাঁধানো সুঁচলো বর্শার মতো। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গৃহস্থের উঠনে ঢুকে দণ্ডটা পুঁতে দেয় মাটিতে। অনেকটা জমি দখলের ভঙ্গী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, গাজী বলতে ইসলামী ধর্মযোদ্ধা। প্রশ্ন, এই ভঙ্গী কি ইসলাম-বিজয়ের প্রতিরূপ নাকি?

এই দণ্ডটির উপরের দিকে পিতলের একটা প্রায় গোলাকৃতি চাকতি লাগানো। চোখ ও ঠোঁটের জায়গায় কাটা গর্ত, নাক উঁচু করা। অনেকটা পাশের ছবির মতো। আদিম কৌম সমাজের টোটেম দণ্ডের স্মৃতি আছে কি এর মধ্যে? অথবা এ যাদুদণ্ডেরই আর এক রূপ?[২৬]

নারীর মুখের আকার, অথচ হিন্দুদেবীমূর্তির মতো নয়, বরং যেন অনার্য

ধরন—একান্ত লৌকিক কোনো দেবতার রূপ। মুসলমান ফকিরের গাজীর গানের সঙ্গে মূর্তিধারী দেবতার এই যোগ [মূর্তি যতই পৃথক ধরনের হোক]

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির লোকায়ত মিশ্রণ সূচিত করে। পুরুষ ধর্মযোদ্ধা গাজীর গানে লক্ষ্মীর পাঁচালির ঢঙে গৃহলক্ষ্মীর মহিমা গীত হতে শুনেছি :

> 'নাইয়া উইঠ্যা যে বা নারী মুখে দেয় পান।
> লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান ॥'

গাজীর গানে দুই সম্প্রদায়ের মিশ্রধর্মের একটি আবেদন থাকলেও, শ্রবণ-দর্শনের কিছু আয়োজনও থাকে। বিশেষত ঐ দণ্ডটির দৃশ্যমান অভিনবত্ব গৃহবাসী নারী শিশুদের বিশেষভাবে নাড়া দিত সন্দেহ নেই। নিচের ছকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

১. টোটেম পোলের স্মৃতি।
২. যাদুদণ্ডের স্মৃতি।
৩.১. ইসলামী ধর্মবিজয়ে গাজীর হাতের ধ্বজা—অস্ত্রের প্রতিরূপ।
৩.২. হিন্দু-দেবতার মূর্তির মতো আকার।

} মিশ্রণ } ীর গানের দণ্ড

১.২. আদিম জীবনের যৌথ অবচেতনাশ্রয়ী বিশ্বাস ও সংস্কারের ফল।
৩. নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলমানের ধর্মসমন্বয়ের নিদর্শন। এই দণ্ড সাংস্কৃতিক সংযোগের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক।

৩.২. সত্যপীরের পাঁচালী

মুসলমানের সত্যপীর কি করে হিন্দুর সত্যনারায়ণ হয়ে ওঠে লৌকিক ধর্মমিশ্রণের সেই রহস্য নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করছি না। হিন্দু বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজোয় যে পাঁচালি পড়া হয়, তার গল্পের আবেদন প্রায় কিছু নেই। তা

দেবমহিমার একটা মামুলী ও তুচ্ছ নিদর্শন মাত্র। কিন্তু দরগার সামনে, মেলায়, আসরে যে-সব কাহিনী পরিবেশন করে মুসলমান গায়েন সত্যপীরের পাঁচালি নামে, পারফরমেন্স হিসেবে সেগুলি অনেক আকর্ষণীয়। মুস্কিল আসানের ছড়া কিংবা গাজীর গানের তুলনায় পীরের পাঁচালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

রয়ানি অষ্টমঙ্গলার পরিবেশনরীতির সঙ্গে এর মিল আছে। চারধারে দর্শক-শ্রোতা, মাঝখানে সঙ্কীর্ণ আসর। গায়েনের সহযোগী জনাদুয়েক দোহার। পায়ে বা হাতে বাঁধা ঘুঙুর, সঙ্গে বাজনদার ঢোল-কাঁসি নিয়ে। ছড়া-আবৃত্তি, গান [বাজনা তখনই বাজে]। দোহারে-গায়েনে দুই চরিত্রের হয়ে সংলাপও বলে। তাতে যুক্ত হয় কিছু নাটকীয়তা গায়েনের হাতে কখনও কালো চামর, কখনও একখানি রুমাল।[২৭] গায়েন-দোহারের অঙ্গভঙ্গী, বিশেষত উত্তেজনার মুহূর্তে তাদের অমুচ্চ লাফালাফি। এ-সবই একটা বাড়তি দৃশ্যময়তা সৃষ্টি করে।

আরব্য-পারস্য রজনীর মডেলে কাহিনী, রোম্যান্টিক প্রেম এবং অ্যাডভেঞ্চারের মিশ্রণ। শ্রোতাদের উত্তেজিত ও আকৃষ্ট করে। সত্যপীরের দয়ায় বিপদমুক্তির নীতিকথা থাকলেও তা এর কাব্যিক-নাট্যিক স্বাদকে নষ্ট করতে পারে না। প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যতই নিঃসম্পর্ক হোক, যতই থাক অতিকল্পনা শ্রোতাদের সঙ্গে এর সহজ সংযোগে বাধা হয় না। জিন-পরী-রাজপুত্র-রাজকন্যা, উড়ন্ত ঘোড়া, আজগুবি রূপান্তর [পুরুষে-নারীতে, মানুষে-পশুতে] শ্রোতাদের সরল চিত্তে শিশুর বিস্ময় এবং হলেও-হতে-পারে অন্য জগতের সত্য—এমন বোধ আনে।[২৮]

বাস্তবতাই মানস-সংযোগের একমাত্র বা প্রধান শর্ত নয়। আর মনে রাখা ভালো 'বাস্তবতা' একটি জটিল ও বহুমাত্রিক প্রত্যয়ে—যান্ত্রিক সারল্যে তাকে বেঁধে ফেলা ঠিক নয়।

● ৪. ঘরে-বাইরে গল্প-বলা, গল্প-শোনা :

৪.১ শিশুদের জন্য

শিশু-কিশোরেরা বা বড়রা, সবাই গল্পের সমান ভক্ত। যারা নিজেরা পড়তে পারে এবং যেখানে বই হাতের কাছে, সেখানে গল্পশোনা গুরুত্ব হারায়। তাই এখনকার পরিশীলিত সমাজে শিশুরাই শুধু গল্পের শ্রোতা, সেকালে ছিল ছেলেবুড়ো সবাই। গল্পবলা পুরনো সময়ে একটা অপেশাদারী আর্ট হয়ে উঠেছিল—অবশ্য একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে, রূপকথা-উপকথা প্রভৃতি লোকগল্পের জন্মই হয়েছিল মুখে মুখে।

সব পরিবারেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, বিশেষত বৃদ্ধারা ছোটদের জন্য গল্পবলিয়ের ভূমিকা নিত—কেউ ভালো বলিয়ে—কেউ নয়, যেমনই হোক।

'ছেলেভুলানো ছড়া'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মত ছিল এবং সেই মোহ এখনও ভুলিতে আমি পারি নাই। আমি আমার মনের সেই মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতি-প্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত লোকগুলি লোক-স্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

"সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনোকালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্ব-গুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ-কাল শিক্ষা প্রথা-অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শতসহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।"[২৯]

রূপকথা-উপকথা সম্বন্ধেও এ-কথা সমানই প্রযোজ্য। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিদ্যাও প্রায় একশ বছর আগের এই ভাবনাকে নাকচ করে না। সহজাত সংযোগের মর্মের কথাটি এই বক্তব্যে ধরা পড়েছে।

একালের সহরে শিক্ষিত পরিবারের শিশুরা এই সংযোগ-প্রক্রিয়ার সীমায় রয়েছে। যে-সব পরিবার অতিমার্জিত বা পাশ্চাত্য রীতির বশ সেখানে এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতাপূর্বের বয়স্করা যে পরিবারে নেই সেখানেও দেশি ছড়ার বদলে নার্সারি রাইমের প্রচলন হয়েছে, রূপকথা-উপকথা মুখে মুখে শোনাবার

রীতি আর নেই। ছাপানো 'ঠাকুমার ঝুলি', 'টুনটুনির গল্প' আছে পড়বার—হয়তো মুখে বলার রীতি সেখানে অনেকটা রক্ষিত। তবুও কিন্তু মুখে গল্প শোনা তো অন্য ব্যাপার। গল্প বলার ঢঙে যে রসের সংযোজন ছিল আর তার খোঁজ মেলে না। শিশুদের কাছে গল্প বলতে গেলে ভাষার বিন্যাসে সুরে অঙ্গ-ভঙ্গিতে যে বিশেষ ধরনের আদর মেশানো আভিনয়িক মাত্রা যোগ করতে হয়, ঠাকুমা-দিদিমারা তা নিজেদের চেষ্টায় আয়ত্ত করতেন। রবীন্দ্রনাথ ছড়া বিষয়ে বলতে গিয়ে এই পরিবেশন-রীতির কথা বলেছেন: '...এই ছড়াগুলির সঙ্গে চির-কাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে আমার মতো মর্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে? পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে, আপন বাল্যস্মৃতি হইতে, সেই সুধাস্নিগ্ধ সুরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সংগীতটি যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্য ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে সে আমি কোন মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব।'[৩০]

রূপকথা উপকথা সম্বন্ধেও একই কথা। রবীন্দ্রনাথ এখানে এই ছড়া বলাকে একটা পারফরমিং আর্ট হিসেবে দেখেছেন এবং নিজ শ্রোতাদের সঙ্গে তার গাঢ় সংযোগের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করেছেন।[৩১]

৪.২ বড়দের জন্য

শিশুদের বেলায় গল্প বলার একটা অশিক্ষিত পটুত্ব আর্ট হয়ে উঠেছিল—তার সংযোগের সীমা পারিবারিক চৌহদ্দি, বড়দের গল্প বলিয়েদের উপরে তার স্মৃতি-বাহিত প্রভাবের রেশ বর্তে থাকবে।

বড়দের জন্য মুখে গল্পবলার প্রচলন আজ অল্পই। গ্রামে এখানে-সেখানে বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে যা বেঁচে আছে, তাকে একটা 'রূপ' হিসেবে ধরা মুসকিল। লোকসংস্কৃতির কোনো গবেষকের লেখায় 'গানের কথা' নামে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গল্প বলার একটি রীতির পরিচয় পেয়েছি। গদ্য গল্পকথনের মধ্যে দু-চার কলি গানের বিন্যাস সেখানে। অন্যত্রও এ-জাতীয় কিছু-কিছু ব্যাপার চালু থাকা সম্ভব। অতি প্রাচীন কাল থেকে বড়দের জন্য গল্প বলা সবদেশে লোকায়ত জীবনে সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। লিখিত গল্পও সেই আদল রক্ষা করেছে দীর্ঘকাল। একজন গল্প বলছে—এই সূত্রে গল্পরচনা ছিল সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি ভঙ্গী।[৩২] ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে করছি এ-কারণে যে রবীন্দ্রযুগে গল্পের পরিশীলিত রূপের মধ্যে তিনি সেকালের মুখে-মুখে গল্প-বলার-রীতি

অনেকখানি নিয়েছেন।

এই রীতির গল্প-বলা বন্ধুদের-আত্মীয়দের ছোট আসরে বা আড্ডায়, ঘরে বারান্দায় বাঁধানো ঘাটে গাছের তলায়। মূলত পারিবারিক পরিমণ্ডল,—কখনও কিছুটা পরিবারের সীমা ছাড়ায়, পরিচিতি ও বন্ধুত্বের মধ্যেই যদিও থেকে যায়,—তাই পুরো নয়, —বলা যায়, আধা-সামাজিক।

অঘোষিত, তাৎক্ষণিক জমে-ওঠা আসরে নানা ধরনের গল্প বলার রেওয়াজ ছিল। ডাকাতি—নৌকাডুবির মতো উত্তেজক ঘটনার বিবরণ, মজার-হাসির-ভূতের কথা, জিন-পরী আর গুপ্তপ্রেমের গল্প, আরবি-ফারসি কিস্‌সা বা ভানুমতি-ভোজরাজার কল্প-কাহিনী—মাঝে-মাঝেই বেশ প্রাপ্তবয়স্ক উপাদান। বিবিধ রসের বিচিত্র আয়োজন, সমানই প্রিয় ও উপভোগ্য-বাস্তব, কাল্পনিক বা আজগুবি, কোথাও সংযোগের তারতম্য ঘটত না। বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে মিশে যেত, তৈরি হত মোহ—কিছুটা তার সাময়িক, শোনার রেশ পরে ধীরে মিলিয়ে যেত, কতক আবার মনের গভীরে সংস্কারে আশ্রয় নিত, সেই-সব সরল গ্রামীণ অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত মানুষের। কখনও বা অতিলৌকিকতা থাকত; কিন্তু সবই মূলত ধর্ম-অসম্পৃক্ত, ভক্তিরসপ্রচারে প্রায় কখনই আগ্রহী নয়। অধিকাংশক্ষেত্রে গল্পবলিয়ে পেশাদার নয়, শখের তাগিদেই সে নিপুণতা অর্জন করে। বিষয়টা তার নিজস্ব না হলেও বলতে বলতে সে নিজের মতো করে বানিয়ে নেয়, ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদি—সে কিছুটা গল্প-রচয়িতাও বটে।

৪.৩ কথকতা

কথকঠাকুর কিন্তু পেশাদার গল্প-বলিয়ে, এবং সে 'ঠাকুর'—ভক্তিরস বিতরণে প্রায় গুরু-পুরুতের মতো। এই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও কথকতাকে আমি গল্প-বলা-শোনার একটি বিশেষ লোকায়ত-রীতি হিসেবেই দেখতে চাই। পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া তুলনামূলক ছকটির দিকে তাকান:

কথকতার অবলম্বন প্রধানত রামায়ণ, কখনও ভাগবত বা রাধাকৃষ্ণ লীলা—আখ্যান, কচিৎ মহাভারতের কোনো গল্প। সর্বদাই কাহিনী-কথন। কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত কাব্য, কিছু গদ্য ভাষ্য ও নতুন গান সহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে। অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিত্তিগ্রন্থ এত সুনিশ্চিত নয়। গল্পের স্বাভাবিক মানবিক প্রসঙ্গ বলতে বলতে ভক্তিবাদের দিক থেকে ব্যাখ্যানে প্রত্যক্ষ ধর্মীয় আবেদন সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। আসরের মধ্যে উঁচু বেদিতে বসে গুরুর মতো মাল্যচন্দনে ভূষিত কথকঠাকুর শ্রোতাদের যেন ভক্তির কথাই শোনায়। ভক্তি-

	শিশুদের	বড়দের	
	রূপকথা বলা	বয়স্কদের গল্প-শোনার আসর	কথকতা
	পারিবারিক	পারিবারিক এবং আধা-সামাজিক	সামাজিক
বলিয়ে	ঠাকুমা প্রমুখ	আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিত কোনো ব্যক্তি	কথকঠাকুর
ভঙ্গী ও পদ্ধতি	সহজাত। কখনও থাকে অশিক্ষিত-পটুত্ব।	অবশ্যই থাকে অশিক্ষিত-পটুত্ব।	পেশাদার। কথকতার বিশিষ্ট পদ্ধতি এদের আয়ত্তে।
আয়োজন	কোনো আয়োজন নেই। ঘরের যে-কোনো স্থানে বসে—শুয়ে	ঘরে, বারান্দায়, উঠোনে, বাঁধানো, ঘাটে, বৈঠকখানায়। ছোটখাট আসর বা আড্ডার মতো।	রীতিমতো আসর। একটু উঁচু বেদীতে, সামনে চৌকি নিয়ে গুরু-পুরুতের বেশে,—গলায় মালা, কপালে তিলক, হাতে সাদা চামর—কথকঠাকুর বসেন, খোল করতাল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র থাকে।
বিষয়	রূপকথা উপকথা	নানা কাল্পনিক কাহিনী	রামায়ণাদি পুরাণের গল্প
	ধর্ম-অসম্পৃক্ত		ভক্তি মুখ্য
শ্রোতা	বাড়ির এক বা একাধিক শিশু	আত্মীয়-বান্ধব পরিচিত জনের ছোট দল	সাধারণ সামাজিক বড় দল

পূত চিত্তে বেশিরভাগ মানুষ শোনে,—কথক পায় প্রণামী, প্যালা নয়—ভিক্ষা নয়। আপাতদৃষ্টিতে এখানে সংযোগের সূত্র ধর্মীয়, কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায় কথকতা একটি পারফরমেন্স, এর আসল কাজ মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদা ও পূর্তিকে নিয়ে।

কথকতা শুনতে যারা ভীড় করে তাদের অনেকে সচেতনভাবে ভক্তিলাভ — পুণ্যলাভ চায়, অনেকে আবার শুধুই গল্পরসের অভিলাষী। ভক্তিকামী শ্রোতারও মনের গভীরে গল্পের লোভ। কোনো কোনো গল্পরসিক পুণ্যলাভকে উপরি পাওনা ভেবে খুশি থাকে। এ-কারণেই নামসঙ্কীর্তন কিংবা সাধনসঙ্গীত যে ধরনের ধর্মসংযোগ—তার সঙ্গে কথকতায় তৈরি সংযোগের বড় রকমের পার্থক্য।

কথকঠাকুরের পেশাদারী দক্ষতা। নাট্য-গীতি-গল্পকথনের এক মিশ্র রূপলোক তিনি তৈরি করেন। কণ্ঠস্বরের উত্থানে-পতনে, চকিতে ঘটনার মেজাজে চমক আনায়, আবৃত্তি থেকে গান এবং গান থেকে সংলাপে বাচনরীতি মুহুর্মুহু বদলে যাওয়ায় নাট্যাস্বাদ মেলে। তা আরও জমে ওঠে কথক যখন বারবার ভূমিকা পাল্টায় – রাম-লক্ষ্মণ মারীচের সংলাপ আবৃত্তি করে। এবং তা করতে গিয়ে একক কথক ভিন্ন-ভিন্ন বহুচরিত্রের রূপদানে শুধু নৈপুণ্যই দেখায় না, দর্শক-শ্রোতাদের মনে অটল বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। অল্প কিছু দর্শক তার কৃতিত্বে বাহাবা দেয়, কিন্তু বেশিরভাগ মেনে নেয়,—এখন রাম পরক্ষণে সীতা কিংবা হনুমান। তারা জানে এ সত্য নয়, তবুও বিশ্বাসে-সম্ভোগে ফাঁকি থাকে না।

৪.৪ পাঁচালি গান

আগে সত্যপীরের পাঁচালির কথা বলেছি। এখন পুরাণাশ্রয়ী পাঁচালির কথা। এদের জন্মলগ্ন সুনির্দিষ্ট—শ-দুয়েক বছরের পেছনে ঠেলা যায় না। প্রধানত দাশুরায় এবং আরও কয়েকজনের রচনা অবলম্বনে এগুলি পরিবেশিত হত। আর এক ধরনের পাঁচালির কথা আমরা পরে বলব, লক্ষ্মী-শনি-সুবচনী-সত্যনারায়ণের-ব্রতকথা-পাঁচালি বলে যারা পরিচিত।

আলোচ্য পাঁচালি কথকতার বংশেই জন্মেছে। রামায়ণাদি পুরাণের গল্প নিয়ে এই পালাগুলি তৈরি। কিন্তু রচনায় এবং উপস্থাপনায় রয়েছে গুরুতর প্রভেদ। পরের পৃষ্ঠায় ছকটি লক্ষ্য করা যাক :

রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের স্মৃতিচারণায় পাচ্ছি : "সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনা

পাঁচালি	কথকতা
১. অর্বাচীন। শ-দুয়েক বছর আগে উদ্ভব।	১. পুরনো জন্মকাল অনির্দিষ্ট।
২. ভক্তি-বর্জিত	২. ভক্তি-আশ্রিত।
৩. লঘু-চটুল ও চপল	৩. গাম্ভীর্য-করুণ কৌতুকের বিচিত্র মিশ্রণ।
৪. অতি সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতগতি	৪. বিস্তৃত এবং ধীরগতি।

হত। ···যেদিন কুশলবের কথা আসিল, 'বীর বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি' করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ উৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণ কালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এ-হেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল; কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।"[৩৩]

চটুলতা এবং সহজ মনোবিজ্ঞানের ক্ষমতা পাঁচালি গানকে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল। পাঁচালির উদ্ভব বিকাশের সময়টা কবি-তরজা-যাত্রা হাফ আখড়াইয়ের। রুচি রচনা-পরিবেশন তিন দিক থেকেই এরা মোটামুটি একবৃত্তের। এরা পেশাদারি দল তৈরি করত। নানা উৎসবে এদের বায়না করে নিয়ে যাওয়া হত। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে দু-চার কথা বলেছেন স্মৃতিচারণাপ্রসঙ্গে: "আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত, 'আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম, তবে

পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব।' শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম, 'ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অন্ত হল, আমার কমল আঁখি', 'রাঙা জবায় কি শোভা পায় পায়', 'কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে,' 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে'—এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত… ।"[৩৪]

এ থেকে অন্তত বোঝা যায়, পাঁচালি গান মাত্র অশ্লীল ও নিম্নরুচি হত না, তাহলে ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুর পর্যন্ত তার প্রবেশ এত সাবলীল হত না।

সে যাই হোক, পাঁচালি গানে কথকতার ধারার সঙ্গে, পুরনো মঙ্গলগান এবং সমকালীন কবিগানের রীতি কিছু মিশেছিল। মূল গায়েনের সঙ্গে একাধিক দোহার যেমন থাকত, বাজনদারেরাও গানের ধুয়া ধরত, বহুচরিত্রের সংলাপে প্রয়োজনমত অংশ নিত। পাঁচালি গানের বড় দলগুলি গড়ে উঠত রচয়িতাদের কেন্দ্র করে। কত আসরে কত নতুন সংযোজন ঘটত, পরিস্থিতি বুঝে নতুন পালাও তৈরি হত। পাচালি গানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝুমুর-খেমটা জাতীয় নাচের স্থান হত। সহজ এবং তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তার পেছনে ছুটলে অনুষ্ঠানের আদি স্বভাব দ্রুত বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অনুমেয় পাঁচালি গান সমকালে সর্বস্তরের জনমনে আলোড়ন এনেছিল প্রধানত চটুলতা, হাস্যের প্রাচুর্য এবং দ্রুতগতির জন্য। এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অবশ্যই এক ধরনের সংযোগ ঘটাত। সাময়িক ভাবে কথকতাকে হারিয়ে দিলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আর্টফর্ম হিসেবে এর মৃত্যু হয়েছে অনেক কাল। তুলনায় অনেক দীর্ঘায়ু কথকতা! তার শিকড় গভীরে ঢুকেছিল বলেই।

● ৫. নায়কেরে বর দিউন :

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে বারবারই ভণিতা দেওয়া হয়েছে :

'নায়েকেরে বর দিউন বিষহরি মায়।'

একথা কবি নিজে লিখুন বা গায়েনের সংযোজন হোক, অথবা কবি স্বয়ং গায়েন হোন, এ-কাব্য, আসরে ব্যাপকভাবে গান করা হোত এবং গায়েন দেবীর কাছে আশীর্বাদ চাইতেন গানের আয়োজক বা গায়কের জন্য।

৫.১. মেয়ে মহলে মনসামঙ্গল পাঠ

বিভাগ-পূর্ব বরিশাল জেলায় [বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তম বরিশাল জেলা] মনসার ভাসান বা রয়ানি গান একটি অতি জনপ্রিয় পারফরমেন্স ছিল। এখন কতটা কি আছে বলতে পারব না। কিন্তু রয়ানি গানের আয়োজনের কথা পরে। অন্য একটি রিচুয়ালের প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করি। গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে, বরিশালের হিন্দু পরিবারগুলিতে—সব অবশ্যই নয়, তবে অনেকগুলিতেই, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল পাঠ করা হত। ব্যাপারটা মেয়ে মহলের এবং মনসা-কেন্দ্রিক ধর্মাচরণের অঙ্গ বলে এই পাঠকে মনে করা হত।

ভালো পড়িয়ে, যে সুর করে পয়ার আবৃত্তি করতে এবং লাচাড়ি বা ত্রিপদী অংশ গান করতে পারে এমন কেউ কন্যা, বধূ, প্রৌঢ়া মুখ্য গাইয়ের ভূমিকা নিত। কখনও বা বিশেষ পরিবারের দাওয়ায় প্রতিবেশিনীরা সময়মতো হাজির হত। মূল গাইয়ের সঙ্গে কেউ কেউ গলা মেলাত। ধুয়া অংশে প্রায় সবাই সুর ধরত। স্বভাবত গাইয়ে ও শ্রোতা—এদের মধ্যে ভেদ থাকত না। অবশ্যই মনসামঙ্গল পাঠ ও গানের এই পারিবারিক আয়োজন [বা প্রতিবেশী-সম্মেলন] ধর্মসংস্কারের এক প্রথানুগ আচার। সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে এই পাঠ গান, মাস শেষে কাব্য পাঠ যেমন শেষ হত চাঁদের মনসা পুজোর বর্ণনায়, তেমনি ঘরে ঘরে ঘটে, পটে [ক্বচিৎ মূর্তিতে] মনসার পুজো—দুই-এক সঙ্গে মিলে যেত।

আরও যে-সব নিয়ম অবশ্য-মান্য ছিল তা হল প্রতিদিন অল্প-বেশি কিছু-না-কিছু পাঠ করা, এবং বাসরে লখীন্দরের প্রাণনাশ আর দেবলোকে প্রাণদান এক বৈঠকে পড়ে ফেলা। সংক্রান্তির দিনে পুজোর সময় চাঁদের মনসা পুজোর বিবরণ অবশ্য পড়া চাই।

রিচুয়ালিস্টিক হলেও, আবৃত্তি ও গানে এই প্রাণবন্ত কাহিনীটি একটি ছোট অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীকে শিল্পভোগী মণ্ডলে পরিণত করত।

৫.২. রয়ানি গান

এই সব ঘরোয়া অনুষ্ঠান থেকে ভাসান বা রয়ানি আসরের পার্থক্য অনেক। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল সেখানে অবলম্বন, কিন্তু পরিবেশনরীতি ও সামগ্রিক ফলাফল মোটেই এক নয়।

কোনো সম্পন্ন গৃহস্থ 'মানসিক'-অনুযায়ী রয়ানির আয়োজন করত। খরচ-খরচা তার। তাকে বলা হত নায়েক। কখনও দেখা যেত বারোয়ারি নায়েকত্ব।

মণ্ডপে মনসার পুজো, সামনে রয়ানির আসর। এক-তিন-পাঁচ-আট-এর যে-কোনো সংখ্যক দিন ধরে গান হত। বেশি দিনের বরাত থাকলে পুরো কাব্য, কম দিনের আয়োজনে কয়েকটি নির্বাচিত পালা নিবেদিত হত।

মূল গায়েন, এক বা দুজন দোহার নিয়ে রয়ানির দল। বাজনার মধ্যে ঢোল বা খোল এবং কাঁসি বা করতাল; পরের দিকে হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হতেও দেখা গেছে। কতকটা পেশাদারি ভিত্তিতে দলগুলি গড়ে উঠত। কবে থেকে বলা কঠিন—তিন চারশ বছর আগে থেকেও হওয়া অসম্ভব নয়। তবে রয়ানি গাওয়া কখনই পুরো সময়ের বৃত্তি হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না—এটুকু অনুমান করা যায়। এরা গ্রামীণ অন্যমানুষদের মতো নানা জীবিকায় যুক্ত থাকত, কখনই স্বতন্ত্র আর্টিস্ট শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ত না। অবশ্য অংশকালীন বৃত্তি বলে, শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রশ্ন ছিল, দক্ষতা-অর্জনের চেষ্টা চলত। সব কিছু স্বতস্ফূর্ততার উপরে ছেড়ে দেওয়া হত না।

মূল গায়েন সাধারণত শিক্ষিত, তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ। আদিতে তিনিই ছিলেন কাব্য-রচয়িতা। পরবর্তীকালেও, মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের আগে পর্যন্ত, তিনি মূল কাব্যে স্বরচিত অংশ, দু-একটি বাড়তি গান যোগ করে নিতেন। ধুতি-চাদর-মাল্যচন্দনে ভূষিত হয়ে আসরের নেতৃত্ব গ্রহণ, হাতে সাদা চামর, সামনে মণ্ডপে ঘটে, পটে, বা প্রতিমায় মনসাদেবী। ভয়-ভক্তির একটা ধর্মীয় সংযোগসূত্র তো ছিলই। তবে কথকঠাকুরের তুলনায় রয়ানির মূল গায়েনে 'গুরু'র উঁচু ভাবটা কম। কথক মূলত বেদীতে বসে পাঠ ও গান করেন, মাঝে মধ্যে উত্তেজক মুহূর্তে দাঁড়িয়েও ওঠেন। গায়েন কিন্তু আসরে শ্রোতা-দর্শকদের সঙ্গে এক সমতলে দাঁড়ায়। সে গুরুগিরি করে না। ধর্মোপদেশ দেয় না, ভক্তিপূতচিত্তে কাহিনী বলে। ঘটনার বিবরণ স্বল্পসুর পয়ারে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা ও শোকপ্রকাশক উক্তি লাচাড়ির গানে, নাট্যমুহূর্তগুলি কিঞ্চিৎ আঙ্গিক অভিনয়ে পেশ করা হয়। দোহারেরা গানে ধুয়া ধরে, কখনও একক সংগীতকে যৌথগীতে রূপান্তরিত করে এবং কথোপকথনের সময়ে মূল গায়েনের বিপরীতে গানের ভাষায় সংলাপ বলে। সনকা-মনসা, বেহুলা-মনসা, চাঁদ-মনসার সংলাপ প্রায়ই নাট্যোচিত—দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ। কোনোরূপ 'কাচকাচনো' নেই—অর্থাৎ নাট্যচরিত্রের বেশভূষা ছাড়াই, নিজ নিজ স্বাভাবিক পোশাকে গায়েন-দোহারেরা কেউ মনসা কেউ চাঁদের ভূমিকা নিয়ে সংলাপ বলে। শ্রোতা-দর্শকেরা সাময়িকভাবে এদের মনসা বা চাঁদ বলে মেনে নিতে অসুবিধা বোধ

করে না। এখানে কথকতার সঙ্গে রয়ানির স্পষ্ট পার্থক্য আছে।

কথকতায় : একা কথক বিভিন্ন ভূমিকাভিনয় করে। কখনো রাম, পরক্ষণে সীতা বা রাবণ হয়ে সংলাপ আবৃত্তি বা গান করে।

রয়ানিতে : ভূমিকাগুলি মূল গায়েন আর দোহারে ভাগ করে নেয়। গায়েন যদি মনসা হয়ে বলে তো দোহার চাঁদ বা বেহুলা হয়ে।

এর জন্য রয়ানির আবেদন বেশি নাট্যিক, আবার কথককে পরপর ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে হয় বলে বাচিক অভিনয়ে কিছু বেশি নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে হয়।

রয়ানিতে সামনে মণ্ডপে দেবী বিরাজমান হলেও, গায়েন বারংবার দেবীর বর প্রার্থনা করলেও রসের আবেদনে ঘাটতি পড়ে না। অতি পরিচিত কাহিনী এবং পাত্রপাত্রী, অভ্যস্ত ও প্রথানুগ পরিবেশন-রীতি—দর্শক-শ্রোতা সমাবেশের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান সহজ ও সরলভাবেই সমাযোজিত হয়।

ঘরোয়া মনসামঙ্গল পাঠ এবং আসরে রয়ানি গানের একটি তুলনামূলক ছক পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল :

চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গলের মতো জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্যগুলি রয়ানিগানের ঢঙেই পরিবেশিত হত। আট দিন ধরে চণ্ডীমঙ্গল-গানের অনুষ্ঠান পরিচিত ছিল 'অষ্টমঙ্গলা' বলে। রূপরামের কাব্যসূচনায় স্বয়ং ধর্মঠাকুর আটদিনের গান রচনা করতে বা গাইতে অর্থাৎ আটদিন ধরে গান গাইবার উপযোগী নতুন কাব্য লিখতে কবিকে নির্দেশ দিয়েছে :

আটদিনের গান গাও রূপরাম।

আটদিনের গান ছিল সবচেয়ে ব্যয় সাপেক্ষ এবং জমকালো অনুষ্ঠান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনেক মঙ্গলকাব্যই খণ্ড খণ্ড পালার আকারে পর পর সাজিয়ে পুরো কাব্যের রূপ দেওয়া হত। বহু পুরনো পুঁথি পাওয়া গিয়েছে যার বিন্যাসটা এইরকমই। কবিদের মাথায় এই পরিবেশন রীতি—জনসংযোগের এই অতি পরিচিত ও প্রিয় পদ্ধতিটি সবসময়ে সজাগ থাকত।

৫.৩. ব্রতকথা বা পাঁচালি

এই সূত্রে 'ব্রতকথা' বা 'পাঁচালি' নামে পরিচিত কয়েকটি রচনার পারফরমিং মূল্য এবং সংযোগ-সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যাক।

শনির পাঁচালি, লক্ষ্মীর পাঁচালি, সত্যনারায়ণের পাঁচালি[৩৫] প্রভৃতি ছোট ছোট কাহিনী-কবিতা খুব পুরনো না হলেও অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঐ সব দেবদেবীর পুজোর অঙ্গ হিসেবে পাঠ করা হয়। আরও আগে থেকেও হতে

	মনসামঙ্গল পাঠ	রয়ানি বা ভাসান গান
গাইয়ে	বাড়ির কেউ—যে সুর করে পড়তে পারে।	পেশাদার, দক্ষ গায়েন।
ভঙ্গী ও পদ্ধতি	পয়ার সুরে আবৃত্তি, লাচাড়ি—প্রায় গান। ধুয়া-অংশে শ্রোতারা যোগ দেয়। কোনো বাদ্যযন্ত্র নেই।	পয়ার সুরে আবৃত্তি—প্রায় গান; লাচাড়ি—পুরো গান সংলাপে—গায়েনে, দোহারে সুরে কথাবার্তা, ধুয়া—দোহার-সহ গান। ঢোল-কাঁসি, খোল করতাল ব্যবহৃত, একালে হারমোনিয়ামও।
বিষয়	কোনো কবির মনসা-মঙ্গল সম্পূর্ণ।	কোনো কবির মনসামঙ্গল সম্পূর্ণ এক বা একাধিক পালা।
স্থান কাল উপলক্ষ ও শ্রোতা	সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে পুরো বই পড়া হয়—ঘরে বারান্দায়, বিকেলে প্রতিবেশীরা আসে—কেউ সময় সুযোগ মতো, কেউ নিয়মিত। একান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠান। গাইয়েতে শ্রোতাতে ভেদ থাকে না।	বাৎসরিক মনসা পুজো বা মানসিক পুজো উপলক্ষে সাধারণত ১/৩/৫/ ৮ দিনের রয়ানি গান দেয় কোনো সম্পন্ন গৃহস্থ। পুজোমণ্ডপের সামনে রীতিমতো আসর বসে। গ্রাম ভেঙে শ্রোতা আসে। সামাজিক অনুষ্ঠান

পারে। সমবেত মেয়েরা ভক্তিপূত চিত্তে দেবতার মহিমা জ্ঞাপক ছড়াটি শোনে। এগুলি স্বাভাবিক লোকায়ত অনুষ্ঠান নয়; লোকায়ত কাহিনী-পরিবেশন রীতির আদলে ব্রাহ্মণপুরোহিতদের আবিষ্কার। গল্পগুলি বিবর্ণ, পরিকল্পনা-মাফিক ও যান্ত্রিক; পাঠও শিল্পগুণবর্জিত। তাকে শিল্পগুণান্বিত করে তোলার চেষ্টা বা ধৈর্যও পরিবেশকদের থাকে না। তারা জানে অন্ধ ধর্মীয়

সংস্কার এক ধরনের সংযোগ তৈরি করতে পারে। পারে ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে তা এতই নগ্ন যে সাংস্কৃতিক সংযোগের কোনো মাত্রায় খোঁজ এখানে মিলবে না।

● ৬. দোরগোড়ায় থিয়েটার :

বাংলার গ্রাম-নাটকের একটা বিশেষত্ব সে দর্শকের জন্য প্রায়ই মঞ্চ সাজিয়ে বসে থাকে না। সোজাসুজি তাদের কাছে হাজির হয়। অনেক সময়েই গৃহস্থের উঠোন গান বা নাটকাভিনয়ের আসর হয়ে ওঠে। এখানে দুটি লৌকিক অনুষ্ঠানের কথা বলব, যেগুলি পুরোদস্তুর সাজসজ্জা করে অভিনয়—দর্শক কিন্তু দোর খুললেই তা দেখতে-শুনতে পায়। এ দুয়ের একটি ধর্মাচারভিত্তিক, অন্যটি পুরোই থিয়েটার।

৬.১. নীলের গান

নীল আসলে 'নীলকণ্ঠে'র সংক্ষিপ্তরূপ। নীলকণ্ঠ শিবকে কেন্দ্র করে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সারা বাংলা বিচিত্র লৌকিক অনুষ্ঠানে মুখর থাকে। পূর্ববাংলার নীলপুজোর গান এবং পশ্চিমবঙ্গের গাজনের সঙ অনেকটা একই ধরনের জিনিস। দুই-ই রিচুয়ালভিত্তিক দৃশ্যাভিনয়। এখন থেকে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে যেমন দেখেছি[৩৬] তার ভিত্তিতে নীলের গানের পরিচয় দিচ্ছি। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবপুজো-চড়ক-মেলা ইত্যাদি। তাকে উপলক্ষ করে নীলের দল সাজপোশাক করে বাড়ি-বাড়ি হাজিরা দেয়। মাগন-আদায় প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হলেও দলের মধ্যে দু-একজন ভক্ত্যাও থাকে, যাদের হয়ত কোনো মানসিক করা থাকে, তারা উপোস করে, হবিষ্য খায় এবং সেজেগুজে নাচগানও করে। শিব, নন্দী ও নারদ [কখনও দু-জনই, কখনও দুয়ের একজন] এবং দুর্গা—সর্বদাই এক বালক এই ভূমিকা নেয়। পুরোদস্তুর সজ্জা, পরচুলা-মেকআপ সহ। তবে সব কিছুই সহজলভ্য এবং সস্তা। ঢোল-কাঁসি নিয়ে বাজনদার থাকে। দলপতি—সে শিব বা নারদ যে ভূমিকাই নিক, একটি সিঁদুরলিপ্ত কাঠের মোটা পাটা নিয়ে আসে, তার উপরে কতগুলি বাঁকানো বেতের টুকরো বাঁধা থাকে এক সঙ্গীর হাতে জলন্ত ধুনুচি। এই ছোট দলটি কোনো গৃহস্থের উঠোনে এসেই শিবের নামে জয়ধ্বনি দেয়। বাজনা বাজে। নীলের পাটা মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়, পাশে ধুনুচি। পরিবারের লোকজন ভীড় করে। তাদের নাম করে বর চেয়ে দলপতি একের পর এক ধুনো ছিটোয় ধুনুচিতে, ফুল ধরে পাটায়। তারপরে সর্বজনের কল্যাণ কামনা করে :

'যার নাম জানি আমি যার নাম না জানি।
সর্বলোকে বর দাও দেব শূলপাণি ॥'

বেশি করে ফুল ধরা এক খাবলা ধুনো ছোঁড়া হয়। পরিচিত-অপরিচিত সর্বলোকের জন্য এই অযাচিত বর-প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নীল-গানের গভীরতর সংযোগ ঘটে দর্শক-শ্রোতা সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

নীলের পাটাটি নিয়ে কিছু ভাবার সুযোগ আছে। নীলপুজো, নীলগান একটি লৌকিক রিচুয়াল বা ধর্মাচার যার সঙ্গে পৌরাণিক শিবেরও কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। এখানে অদ্ভুত আকারের ঐ নীলের পাটাটি একটি এমন সংযোজন যার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ জটিল হয়ে ওঠে।
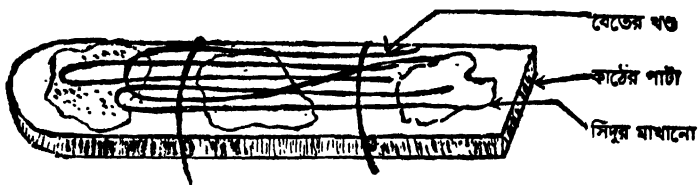
আমার মনে হয় নীলের পাটায় নানা উৎস থেকে এসে বিভিন্ন তাৎপর্য প্রতিফলিত। যেমন:

১. কাঠের পাটায় সিঁদুরের রক্তলাল অনুলেপন, বর্তমানে হিন্দু গৃহবধূদের কাছে সতী-সিঁদুররূপে সম্মানিত হলেও পুজোয় পশুবলির অনুষঙ্গই সহজে, সর্বাগ্রে মনে আসে। শৈব ধর্মাচারে পশুবলি অসঙ্গত বলেই এর উৎসে কোনো প্রাচীন তান্ত্রিক অনার্য লোকায়ত ধর্মাচার হওয়া সম্ভব। পাটাটি যূপকাষ্ঠের প্রতিনিধি কি?

২. গ্রামপ্রান্তে পুজোর থানে দেবরূপে কল্পিত গাছ, গাছের কাণ্ড, পাথর বা কাঠের খণ্ড—পাটার চেহারা কতকটা সদৃশ। নীলের পাটা কি এদের প্রতীক? নীলের গান কি পুরনো প্রস্তর-বৃক্ষ-কাষ্ঠ উপাসনার গ্রামীণ থানকে বহন করে নিয়ে এল অঙ্গনে?

৩. বাংলার পল্লীর কুটির শিল্পের দুটি প্রধান বনজ উপাদান বাঁশ ও বেত। কিন্তু কি তাৎপর্য লুকিয়ে আছে নীলের পাটায় বেত-টুকুরোর পেছনে বলা কঠিন। রক্তসিঞ্চনে [গোলা সিঁদুর] বনদেবতার পুজো? বেতের ধামা পেটরা বোনায় অভিজ্ঞ কোনো বিশেষ বর্ণের [যেমন বাঁশের কাজ ডোমদের] লোকদের কি আদিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই রিচ্যুয়ালে নাট্যাভিনয়ে?

নরবলি-পশুবলির রক্ত ছিঁটিয়ে কৃষি বৃদ্ধির যাদুবিশ্বাসের এ কোনো তির্যক রূপান্তর নাকি ?

৪. সব মিলে নীলের পার্টা একটা যাদুবস্তু, যা আপাত হিন্দু লোকাচার ভেদ করে যৌথ নিজ্ঞানের গভীরে বিস্মৃত বোধের ক্ষণিক সাক্ষাৎ ঘটায়।[৩৭]

সেখানে গণসংযোগ নিবিড় হবার সম্ভাবনা।

নীলের গানে নারদ বা নন্দী মোটা দাগের হাস্য পরিবেশন করে থাকে। প্রায়ই তা যদৃচ্ছ, এবং মাঝে-মাঝেই তাৎক্ষণিক, সামনে আছে এমন কোনো ব্যক্তি বা ঘটনা অবলম্বনে উদ্ভাবিত। এভাবেই অভিনেয় ব্যাপারে দর্শক-শ্রোতার সহজ অংশগ্রহণ।

মূল পালা একটিই। প্রতি বছরই তার অভিনয়। সকলের জানা বলে চমক নেই, কিন্তু বাৎসরিক বলেই দুর্লভ, তাই একঘেয়েমির ক্লান্তিও নেই। আরও একটি কথা, গ্রামীণ জীবনে কিছুকাল আগে পর্যন্ত এক ধরনের সরলতা নিশ্চিন্ততা বৈচিত্র্যের অভাব এবং মানস-আলস্য ছিল। প্রতি বছর একই অনুষ্ঠান, তাদের আগ্রহ কমাত না—পরিচিত বলেই তা প্রিয়, যেমন প্রিয় আত্মীয়স্বজন।

নীলের পালায় জমাটি গল্পরস থাকত না, কতকটা চিত্রধর্মী। বুড়ো গরিব বর শিব, ধনীর কন্যা তরুণী পার্বতী। এদের নাম করে বাঙালি পরিবারেই দাম্পত্যকলহ ও শান্তির কথা। মঙ্গলকাব্যের গোড়ায় এবং শিবায়ন জুড়ে এই সব বিষয়। তবে নীলের গানের লোকেরা ঐসব কাব্যকাহিনী থেকে সঙ্কলন করেনি, কারণ তারা অশিক্ষিত গরিব লোক, কথকঠাকুর-রয়ানি গায়কের মতো কবি বা পণ্ডিত নয়। তারা এসব কিছু লৌকিক সাহিত্যের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সরাসরি নিয়েছে। যেমন নাকি নিয়েছিলেন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য-শিবায়নের কবিরা।

নীলের গানে দু-চারটি কথা, সবটাই গানে সংলাপ। দীর্ঘকাল চলে-আসা একই গান :

> ‘শিব বলে ওগো গৌরী তুই তো বড় যুবতী।
> আমি একটু হইছি বুড়া তাতে তোমার ক্ষতি কি’ ॥ —ইত্যাদি

কচিৎ সামান্য রূপভেদ, অথবা স্থানান্তরে রূপান্তর।

গানের সঙ্গে নাচ এবং গদ্যাংশ যদি সামান্য কিছু থাকে তো অঙ্গভঙ্গী। পার্বতী যখন নেচে গাইছে, শিব মৌন থাকলেও নাচের অংশীদার। একালের মনোভাবে ভাবলেও নীলের গান পুরো নাট্যাভিনয়—অপেরাটিক।

নীলের গানের লোকেরা কিন্তু পেশাদার গাইয়ে-অভিনেতা নয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য কোনো অনুশীলন তারা করে না, কোথাও শিক্ষানবীশিও নয়। ভাগচাষী খেতমজুর বা গ্রামীণ বেকারদের মধ্য থেকেই এদের দলগুলি গড়ে ওঠে। এক ফসলের যুগে মাঠে যখন কাজ থাকত না তখনই হত এই উৎসব। শিবের বারোয়ারী পুজোর জন্য মাগুনের কিছু অংশ থাকে, কিছু এদের নিজেদের আয়—পারিশ্রমিক আনন্দ ও পুণ্য বিক্রি করার। সবাই এরা কাছাকাছি গাঁয়ের লোক, যতই রঙ মাখুক, দেবতা সাজুক—নিজেদের থেকে পৃথক করে দর্শকেরা এদের দেখে না।

৬.২. বহুরূপী

নীলের গানের মতো বহুরূপীও সাজপোশাক সহ পুরোদস্তর নাট্যাভিনয়। এক্ষেত্রেও নাটক চলে আসে দর্শক-শ্রোতার বাড়ির উঠোনে। তবে এ-দুয়ের মধ্যে কিছু গুরুতর পার্থক্য আছে। যেমন :

নীলের গান	বহুরূপী
১.১. ধর্মাচার ভিত্তিক	১.১. ধর্ম অসম্পৃক্ত
২. বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এর অনুষ্ঠান	২. বর্ষা ছাড়া বছরের যে-কোনো সময়ে অনুষ্ঠান হতে বাধা নেই।
৩. ভক্ত্যা এবং সহযোগীরা অনুষ্ঠাতা	৩. শিল্পীরা অনুষ্ঠাতা।
২.১. কাছাকাছি গাঁয়ের গরিব খেত-মজুর, বেকার যুবকেরা অনুষ্ঠান করে।	২.১. গান গাইবার বা অভিনয়ের ক্ষমতা থাকলে গরিব চাষীদের মধ্য থেকে দলে দু-একজন থাকতে পারে। তবে সাধারণভাবে তথা-কথিত উচ্চবর্ণের নিম্নবিত্ত মানুষই এর পরিচালক।
২. কোনো অনুশীলন বা শিক্ষানবিশি থাকে না।	২. শিক্ষানবিশির পটভূমি না থাকলেও দলগত বা ব্যক্তিগত অনুশীলন প্রয়োজন হয়।

নীলের গান	বহুরূপী
৩. পেশা নয়। অনুষ্ঠানের ফলে পরোক্ষ ভাবে কিছু আয় হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নীলপুজোর মাগুন।	৩. সরাসরি পেশাদারী।
৪. একটি মাত্র একটি প্রসঙ্গের রূপায়ন হয়। লৌকিক ও পৌরাণিক মিশ্র বিষয়।	৪. বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিবিধ পালা পরিবেশিত হয়। পৌরাণিক লৌকিক এবং সামাজিক বিষয়।
৫. আভিনয়িক আয়োজন যৎসামান্য।	৫. আয়োজন-উপকরণ পর্যাপ্ত না হলেও নীলের গানের মতো হত-দরিদ্র নয়।

বালক বয়সে আমি নিজে বছরের পর বছর দু-ধরনের বহুরূপী দেখেছি। একজন একা সঙ দেখাত, অন্যজন ছিল ছোট একটি দলের নায়ক। লোকসংস্কৃতির চর্চা যারা করেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং এ-বিষয়ে যে সামান্য দু-একটি লেখা আছে তার সাহায্যে বুঝেছি, বহুরূপীর মধ্যে রয়েছে স্পষ্ট দুটি শ্রেণী, একক-অভিনয়ের এবং যৌথ-অভিনয়ের। এদের পারফরমেন্সের রীতিনীতি, বিষয়-নির্বাচন, পালাগঠন সবই এত পৃথক যে এদের দুটি ভিন্ন প্রজাতি বলে সংশয় জন্ম। এদের উদ্ভবের ইতিহাস এবং সামজিক অবস্থানও মোটেই এক রকমের নয়।

অনেকের ধারণা একক-অভিনয়েই বহুরূপীর আদিরূপ। পরে যাত্রার প্রভাবে যৌথ-অভিনয়ের রীতিটি প্রধান হয়েছে। আমার মনে হয়, একক ও যৌথ দুটি স্বতন্ত্ররূপের সূচনাও পৃথকভাবে হয়েছে। এদের কোনো একটি বিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয়টি হয়ে ওঠেনি। তবে-একক বহুরূপী বোধ হয় প্রাচীনতর এবং এর কাছ থেকে যৌথ রূপরীতিটি কিছু শিক্ষা নিলেও নিতে পারে। এই দুই ধরনের বহুরূপীর পার্থক্য পরের পৃষ্ঠায় দেখান হল:

একক	দলবদ্ধ
১. সাধারণত দিনের অনুষ্ঠান।	১. প্রধানত রাতে।
২. পরপর ৩।৪ দিন অনুষ্ঠান একটা অঞ্চলে।	২. গ্রামগঞ্জে এরা ৫।৭ দিন পর্যন্ত অভিনয় দেখায়।
৩. বিষয়-প্রধানত সামাজিক।	৩. বিষয়-প্রধানত পৌরাণিক।
৪. একটি চিত্র বা চরিত্রভঙ্গী রূপায়িত হয়। পূর্ণাঙ্গ কোনো দৃশ্য নয়। গল্পের আবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না।	৪. পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যের অভিনয়, যার মধ্যে একটি গল্প বৃত্ত—অন্তত তার আভাস থাকে।
৫. এক-এক বাড়িতে অবস্থান অনূর্ধ ১০।১৫ মিনিট।	৫. এক বাড়িতে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা থাকতে হয়।
৬. আভিনয়িক-আয়োজন যৎসামান্য।	৬. আয়োজন-উপকরণ ছোটখাট গ্রামীণ যাত্রাপার্টির মতো।

শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে' ছিনাথ বহুরূপীর কথা বলেছিলেন। সে বাঘ সেজে ভয় দেখিয়ে আনন্দ দিতে চেয়েছিল। এটি বহুরূপীর একক রূপ। বাঘ সিংহ সেজে ভয় দেখানো এবং শেষপর্যন্ত মুখোস খুলে শিশুর কান্না থামানো একক বহুরূপীর একটি জনপ্রিয় বিষয়। আমি 'হঠাৎ বাবু' নামে শহুরে বিলাসী অহংকারী বাবুর এক ক্যারিকেচার দেখেছি। পঞ্চাশ বছর আগে দেখা একটি আহত কৃষকের ছবি এখনও মনে পড়ে। গামছা বাঁধা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কাস্তে। ছেঁড়া গেঞ্জি-লুঙ্গি রক্তে ভাসাভাসি। সে আর্ত চীৎকার করে এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি ছুটে যাচ্ছে। হয়ত সে জানত না, বহুরূপীর এই চলচ্চিত্র শোষণ ও

উপবাসক্লিষ্ট, শক্তিমানের আক্রমণে রক্তাক্ত গরিব জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিল।

বাউল-বৈরাগী 'একা'ই বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়, কথক 'একা'ই বিভিন্ন ভূমিকাভিনয় করে, দস্তানা-পুতুল নাচিয়ে শিল্পী 'একা' কারখানার গেটে অনুষ্ঠান দেখায়, কিংবা একের পর এক গৃহস্থের উঠানে হাজির হয়, গাজীর গানের গায়ক, মুস্কিল আসান সকলেই একক, সকলেই ভ্রাম্যমান। একারণেই মনে হয় একক-বহুরূপী-প্রদর্শনী বাংলার লোকায়ত অনুষ্ঠানে বহু-ব্যবহৃত রীতির আদর্শে গড়ে উঠেছিল। শিক্ষানবিশির সুযোগ থাকার কথা নয়। অভিনয়ের আগ্রহ থেকে বিষয়-পরিস্থিতি নির্বাচন, সাজসজ্জা এবং অভিপ্রেত রসসৃষ্টির সচেতন কলা-কৌশল এদের রপ্ত করতে হয়। একক-অভিনয় বলে ঘটনা বা সংলাপে দর্শক আকৃষ্ট করার সুযোগ থাকে না। ক্রিয়ার প্রাধান্য, সামান্য একক-সংলাপ [উত্তর দেবার কেউ নেই বলে বিস্তৃত হতে পারে না] হয়ত একটি গান এদের অবলম্বন। শিল্পবোধ না থাকলে এরা এভাবে বিষয় নির্বাচন ও বিন্যাস করতে পারত না যাতে শিল্পীর সংখ্যা [একজন], অনুষ্ঠানের সময় [খুবই সংক্ষিপ্ত] এ-দুটি সূত্রকে ঠিকঠাক কাজে লাগানো যায়।

একক-বহুরূপী নিজ গাঁয়ের কাছাকাছি গঞ্জ সহর গ্রামে অভিনয় দেখিয়ে বেড়ায়। মূলত গরিব, দূরে যাবার সুযোগ-সঙ্গতি প্রায়ই থাকে না। তা-ছাড়া বহুরূপী দেখিয়ে সামান্য আয়ের উপরে নির্ভর করলে চলে না, খেতে খামারে কাজ, জনমজুরি করতে হয়। এলাকা ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ-ধরনের একজন শিল্পী অধিকাংশ দর্শক-শ্রোতার কাছের লোক, হয়ত ব্যক্তিগতভাবেও কারুর কারুর পরিচিত। একদিকে পুরোপুরি সাজপোশাকে অভিনয়, অন্যদিকে একান্ত ঘরোয়া পরিমণ্ডল।

দলবদ্ধ বহুরূপীর পরিক্রমার সীমা কিছু বিস্তৃত, জেলা জুড়ে বা সংলগ্ন অন্য অঞ্চলেও তাদের গতিবিধি। তবে তার চেয়ে বেশি নয়। এদের শক্তিসামর্থ্য কম, ছোট দল। ফলে যে সীমানায় এদের যাতায়াত সেখানকার লোকদের সঙ্গে এমন কি গৃহস্থ বাড়ির বউ-ঝিদের সঙ্গেও পরিচয়। প্রদর্শনী রাতে, দিনে এ-বাড়ি সে-বাড়ি গল্পগুজব করে পান খেয়ে যায় শিল্পীরা।

দলবদ্ধ বহুরূপী যাত্রাপার্টির ছোট সংস্করণ। হয়ত দলছুট কোনো যাত্রাভিনেতা ছোট দল গড়ে বহুরূপী দেখায়। ফলে নায়কের অন্তত কিছু শিক্ষানবিশি থাকেই। দলগত অভিনয় বলে এদের অনুশীলনও করতে হয়। এটা শিল্পীদের প্রধান

আয়ের পন্থাও বটে। পালাগুলি যাত্রার আদলে গড়া হলেও পার্থক্য আছে। একটি বা দুটি দৃশ্যে বড় জোর আধ-ঘণ্টার মধ্যে গুছিয়ে শেষ করতে হবে। আবার অন্য বাড়ি। রচনাটিতে একাঙ্কের একাগ্রতা আনতে হয়, শাখায়িত বিস্তার বা ফেনানোর সুযোগ থাকে না। তার মধ্যেই গান, কিছু গদ্য-সংলাপ, কিছু ভাঁড়ামি, খানিক ভক্তিরস থাকে। পুরাণশ্রয়ী গল্প বা কৃষ্ণলীলা-আখ্যান জনপ্রিয় বিষয়। আমি বালক বয়সে পূর্ববঙ্গে গ্রামের দেবীপূজা বা অকাল-বোধন এবং কালীকাচ বা কালীর অসুর-নিধন বারবার দেখেছি। পরে পশ্চিমবঙ্গে নন্দোৎসবের অভিনয়ও দেখা গিয়েছে। মুখোস-পরা সিংহ, হনুমান, বাড়তি আট হাত বাঁধা দুর্গা, নয় মুণ্ড জোড়া রাবণের কথা স্মৃতিতে আছে।

বহুরূপীর দলকে কেউ আমন্ত্রণ জানিয়ে আসর সাজায় না, এরা নিজেরা চলে আসে, মফস্বল সহরে, ঘর ভাড়া নেয়—থাকা-খাওয়া এবং গ্রীনরুমের কাজ সেখানেই হয়। সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে হ্যারিকেন নিয়ে বেরোয়, বাড়ির উঠোনে একটি ক্ষুদ্র নাট্যপালা অভিনীত হয়, পরের বাড়িতে যায় বা ঘনবসতি হলে দুতিন বাড়ি অন্তর। অথবা ওরা জেনে গিয়েছে কোন্ কোন্ বাড়িতে সিধে-কড়ি মেলে—সেখানে যেতেই হয়। দুদিন / তিন দিন ধরে একটি পালা সহর ঘোরে, তারপর দ্বিতীয় পালা।

পুরোপুরি নাটক ; কোনো ধর্মাচারের অঙ্গও নয়। একেবারে ঘরের সামনে যে থিয়েটার, গৃহস্থের জন্যই বিশেষভাবে করা—সে আসরের অন্যতম দর্শক নয়, সে-ই একমাত্র এই বোধ সংযোগকে গভীর করে তোলে।

● ৭. পুতুল খেলা : ছোটদের, বড়দের

পুতুল-নাচ জনপ্রিয় সারা পৃথিবীতে।[৩৮] প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত। পুতুল-নাচই একমাত্র লোকায়ত শিল্প-প্রজাতি যা বিশ্বজনীন। অবশ্য দেশে দেশে এর রূপ ও পরিবেশন-রীতিতে অনেক পার্থক্য। বাইরের নানা দেশে পুতুল-নাচ বা পুতুল-টেকের [ওরা সব কিছুই বোঝায় 'পাপেট্রি' শব্দ দিয়ে] ব্যাপক উন্নতি ঘটিয়েছে। আমাদের দেশেও দু-চারজন শিল্পী ও কারুবিদ এদিকে কিছু ভালো কাজ করেছেন। তবে তাঁদের ঋণ বিদেশের কাছে ; লোকায়ত পুতুল-নাচ থেকে তাঁরা বড় কিছু নিতে চাননি।

শহরের মঞ্চে নিপুণ আলোকসম্পাতে-দৃশ্যসজ্জায় এবং বিবিধ যান্ত্রিক কৌশল-সহযোগে পুতুল-নাচ দেখানো হয়। পাকা শিল্পীর হাতে গড়া রকম-বেরকমের পুতুল—কোনোটি বাস্তবের অনুকৃতি, কোনোটি কল্পনায় রঙিন অথবা ব্যঙ্গে বক্র। এই আঙ্গিকের সুযোগ এবং সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে বিষয়-নির্বাচন এবং উন্নত মানের নাট্যরচনা পুতুল-নাচকে এমন একটা মানে পৌঁছে দিচ্ছে, যার সঙ্গে বাংলার গ্রাম-ভিত্তিক পুতুল-নাচকে তুলনা করে লাভ নেই। এই গ্রামীণ শিল্পটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট অনুজ্জ্বল এবং প্রথাজীর্ণ; তবুও গ্রামে দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে। আশ্চর্যভাবে বেঁচে আছে এই ক্ষীণপ্রাণ শিল্প। খুঁজে দেখা দরকার সেই লুকানো শক্তি কোথায়। সেই শক্তিতেই এর গণসংযোগের রহস্য। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা বলা দরকার :

১. পুতুল নাচ জাতীয় লোকায়ত পারফরমেন্স থেকে বিবিধ সম্ভাবনাকে নাগরিক কলা আত্মসাৎ করে নিয়েছে এবং নিচ্ছেও কিন্তু এই গ্রহণ একমুখী। গ্রামীণ শিল্পকে কোরা উপাদানের মতো ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে শহরের অনুষ্ঠান, কিন্তু এর কোনো বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া দেখছি না। নতুন নতুন উদ্ভাবন সম্পর্কে গ্রামের প্রদর্শক খবরই রাখে না।

নাগরিক আত্মীকরণের একটি শিল্পসমৃদ্ধ নিদর্শন হল রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'। তখনও এ দেশে পুতুল নাচের অভিজাত নব্য রূপ দানা বাঁধেনি। লোকায়ত পুতুল-নাচ দেখেই রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ'-এর প্রয়োগ-পরিকল্পনা করেছিলেন। এর রূপে-রীতিতে এবং প্রাণেও ঐ লৌকিক কলা ঢুকে বসে আছে।[৩৯]

২. সিনেমায় অনেক কাল আগে থেকেই ওয়াল্ট ডিসনে প্রমুখের 'অ্যানিমেটেড কার্টুন' ছবি চলে আসছে। সম্প্রতি টিভির দৌলতে সব দেশেই এর ব্যাপক প্রসার। এদের পুতুল নাচের অত্যাধুনিক সংস্করণ বলে গ্রহণ করায় বাধা দেখি না। বিভিন্ন দেশের লোকায়ত 'পাপেটরি' থেকে এঁরা নিয়েছেন এবং তার অন্তর্লীন ও অনেকখানি সংজ্ঞাত গণসংযোগ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন।

বাংলার গ্রামে এখনও পুরনো ধরনের পুতুল নাচ প্রচলিত, । বেশ জনপ্রিয়ও। দস্তানা বা হাতপুতুল, ডাং বা বাঁশপুতুল এবং সুতো-পু ল— এ দেশেও এই তিনরকম। সবগুলোই এখন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ। দর

দিকে লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের নজর তেমন পড়েনি—ফলে এদের উৎকর্ষ যেমন ঘটেনি, তেমনি পুরনো রূপও বদলায়নি। শিল্পীরা খুবই গরিব। ফলে পুতুল তৈরি সাজগোজ—সব আয়োজনেই দীনতার চিহ্ন। একে পেশা হিসেবে নিয়ে বাঁচা যায় না, তবুও বাধ্য হয়ে কেউ নেয়; অনেকেই অবশ্য চাষবাস বা দিন-মজুরির ফাঁকে এই কাজ করে।

পুতুলগড়া, তাকে নাড়াবার কলকৌশল তৈরি করা ও চালানো অভ্যাস করা, গানে গানে পালা বাঁধা, বিশেষ ধরনের মঞ্চসজ্জা—কখনো শিল্পী দৃশ্যমান মঞ্চের নীচে বা উপরে—সচরাচর লোকচক্ষুর আড়ালে এবং শেষপর্যন্ত গানের সঙ্গে পুতুলের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গতিবিধান—এমনি নানা দিকে দৃষ্টি রেখে পুতুল নাচকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হয়। তিন ধরনের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ হল :

১. পুতুলের মুখমণ্ডল মাটির প্রতিমার ছাঁদে তৈরি। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জামাকাপড়ে ঢাকা।

২. বড় বা ছোট মঞ্চ একটি থাকবেই। দাঁড়া পুতুল-নাটকে মঞ্চ একটু বড় হবে। পুতুলগুলিও তুলনায় বড়। সুতো পুতুলের নাচে মঞ্চ আগেরটির তুলনায় অনেক ছোট। দস্তানা-পুতুলের খেলায় মঞ্চ খুবই ছোট হওয়া দরকার; কারণ পুতুলগুলোও আঙুলের ডগায় নাচানাচি করার মতো ছোট। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে মঞ্চ অপরিহার্য। দস্তানা পুতুলের নাচ মঞ্চ ছাড়াও হয়ে থাকে। সে কথায় পরে আসব।

৩. মঞ্চের সামনে প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন রকমের পর্দা থাকে, যা পুতুল-নাচের সময়ে মঞ্চের অংশ বিশেষকে দর্শকদের থেকে আড়াল করে রাখে। এটা ড্রপ-সিন জাতীয় জিনিস নয়। দাঁড়া-পুতুলের বেলায় মঞ্চের নিচের দিকটা ঢাকা থাকে, শিল্পীরা সেখানে থেকে লাঠির ডগায় বাঁধা পুতুলগুলিকে চলায়। দর্শক শিল্পীদের নয়, পুতুলগুলো দেখতে পায়। সুতো পুতুলে উপরের দিক ঢাকা থাকে। সেখানে বসে শিল্পীরা সুতোর সাহায্যে পুতুল নাচায়। দস্তানা-পুতুল নাচানো হয় টেবিলের মতো ছোট মঞ্চে হাত তুলে, কলাকার নিচে ঢাকা জায়গায় বসে অথবা পর্দার পেছনে বসে ফাঁক দিয়ে মঞ্চে হাত বাড়িয়ে নাচ দেখায়। অবশ্য এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানে কলাকার প্রায়ই পর্দা-ঢাকা থাকে না। দর্শকের সামনে বসে অনুষ্ঠান করে।

মঞ্চ ও পর্দা সংক্রান্ত এই ব্যবস্থাগুলি কতগুলি বিশেষ প্রয়োজনেই এসেছে।

কিন্তু অন্যসব অনুষ্ঠানের থেকে এখানে পুতুল-নাচ আলাদা। দর্শকদের মাঝখানে সমতলে অধিকাংশ লোকায়ত পারফরমেন্স ঘটে থাকে। ছৌ-এর মতো সুসজ্জিত নৃত্যনাট্যও। গণসংযোগের দিক থেকে এর তাৎপর্য সুগভীর। দর্শক-শ্রোতা এবং অনুষ্ঠাতাদের এক সমতলে অবস্থান এবং মঞ্চের অব্যবহার প্রোসেনিয়ামের দূরত্ব ও ব্যবধান আসতে দেয় না। ফলে গণসংযোগের একটা বড় সমস্যার অস্তিত্বই থাকে না। পুতুল-নাচ কি সে সুযোগ হারিয়ে বসে আছে ?

পুতুল-নাচের সঙ্গে অন্য থিয়েট্রিকাল পারফরমেন্সের বড় পার্থক্য—অন্যত্র মানুষই অভিনেতা, এখানে পুতুল। এখানে পুতুলকে মানুষ বলে ভেবে নেওয়া। ব্যাপারটা গোড়াগুড়ি তৈরি করা—কৃত্রিম। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মঞ্চ-পর্দার কৃত্রিমতা। কারুবিদ্‌-শিল্পী থাকছে আড়ালে, পুতুলেরা নাচছে—অভিনয় করছে, এই অসম্ভবকে সত্য বলে বিশ্বাস করাতে, জেনে বুঝে বিশ্বাসের ছলনা বিস্তার করতে এক্ষেত্রে প্রসেনিয়ামের ব্যবধান তৈরি করা হল। এই নাট্য-ব্যাপার যে নেহাতই বানানো থিয়েটার, জীবনের অংশ নয়—একটু সরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করবার—এই এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা এখানে অভিপ্রেত। না করলেই সেটা জবরদস্তি হত। এক্ষেত্রে এলিয়েনেশনের সঙ্গে সূক্ষ্ম টানাপোড়েনেই বুনট কমিউনিকেশন। সত্যি বলতে কি সর্বত্রই সহজ গণসংযোগের গর্ভেরও বিচ্ছিন্নতা-ব্যবধান কোনো-না-কোনো মাত্রায় থেকে যায়। সমস্যার আকারে না হলেও থাকে সংলগ্ন হয়ে।

পুতুল-নাচে দর্শক পুতুলকে দেখে নাচতে, নাটক করতে। কোনো পুতুল হরিশ্চন্দ্র, কেউ শৈব্যা। অবিশ্বাস্যকে দর্শক বিশ্বাস করে। কিন্তু যাত্রাপালায় যারা হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যা সাজে তাদেরও তো ঐ সব পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব বলে জোর করেই মেনে নিতে হয়। দুটোই মায়ালোক। তবে পুতুলের মানবাচরণে বিশ্বাস—পরিমাণে যতটাই হোক, একটু বেশি বাড়াবাড়ি। তার কতকটা শিল্পবোধ না জন্মালে যেমন শিল্প-সম্ভোগ ঘটে না, তেমনি হয় না গণসংযোগও।

অবশ্য একটু তলিয়ে ভাবলে খোঁজ মিলবে যে পুতুলের ব্যাপারে আমাদের মনে অনেকগুলো দুশ্ছেদ্য গাঁঠ রয়ে গিয়েছে। তাদের ধরেই সংযোগ এখানে গাঢ় সক্রিয়।

১. শৈশব-কৈশোরের পুতুলখেলার স্মৃতি। পুতুলকে মানুষ ভেবে পুরো মগ্ন থেকেছে যে শিশু, তার মনের গভীরে অচেতনভাবে বড় হয়েও পুতুল-মানুষে মিলের বোধ না থেকে পারে না।

২. হিন্দুর কাছে পুতুলই প্রতিমা। মণ্ডপে-মন্দিরে তার পুজো। তাঁকে অনন্ত প্রাণের উৎস বলে বিশ্বাস করে বলেই তাতে মানবত্ব আরোপে তার দ্বিধা থাকে না।

৩. মানবাকার পুতুলে মানবপ্রাণ কল্পনা করে আদিম যাদুবিশ্বাস একে যুক্ত করত বংশবৃদ্ধি ও শত্রু বিনাশ ক্রিয়ার সঙ্গে। এখনও তুকতাক মারণ-উচাটনে, ডাইনিকলায় তার জের চলছে।[৪০] যৌথ নির্জ্ঞানে যুগযুগ ধরে জমে থাকা বিশ্বাসের বলে পুতুল আর সহজ সামান্য পুতুল থাকে না।

৪. সব তত্ত্ব বাদ দিয়ে দেখলে, পুতুলের এই মানবাচরণ একটা বিস্ময়ের যোগ ঘটায় দর্শকের উপভোগে।

এত সব গূঢ় কারণের জন্যই সম্ভবত আধুনিক গণসংযোগের প্রশ্নেও পুতুল-নাচের ভূমিকার গুরুত্ব নিয়ে প্রায় সর্বজনীন ভাবনা আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুতুল-নাচের বর্তমান জীর্ণ ও দীন অবস্থা দেখে বোঝা যায় ঐ সব সুযোগ সম্ভাবনাকে তারা মোটেই কাজে লাগাতে পারেনি, কারণ যা-ই হোক না কেন। তুলনায় দস্তানা-পুতুলওয়ালারা এমন কিছু গতিশীলতা দেখিয়েছে যার তাৎপর্য চোখ এড়াবার নয়। এই শিল্পীরা সামান্য উপকরণ নিয়েই অনুষ্ঠান করে থাকে। দু-তিনজনের দল হয় তো ভালোই, একাও প্রদর্শনী করা চলে যদি শিল্পীর গলায় সুর, অন্তত সুরেলা আবৃত্তির ক্ষমতা থাকে। তাহলে আঙুলে পুতুল নাচাবার সঙ্গে গান গেয়ে বা আবৃত্তি করে বাজনা ছাড়াই কাজ চালিয়ে নেয়। তবে সুবিধা দু-তিনজনের দল হলেই, তার বেশি নয়। লোকায়ত অন্য যাবতীয় অনুষ্ঠান থেকে তারা শিখেছে—মঞ্চ ব্যাপারটা অপরিহার্য নয়, তারা যে-ধরনের পুতুল-নাচ দেখায় তার জন্য তো নয়ই। ফলে তারা দর্শকের জন্য বসে না থেকে সোজা তাদের কাছে চলে আসে। গঞ্জে-বাজারে-মেলায় তারা পুতুল-নাচ দেখাতে বসে যায়, মঞ্চ বাঁধে না। কোথাও বাঁধা মঞ্চ পেলে আপত্তিও নেই। ক্বচিৎ দর্শকের ভীড় জমলে একটু উঁচু জায়গা থেকে দেখালে সুবিধা—এই পর্যন্ত। কারখানার গেটে, রেলওয়ে স্টেশনে, যাত্রীবহুল পথের ধারে এবং গৃহস্থের বাড়িবাড়ি ঘুরে তারা অনুষ্ঠান দেখায়। এই দিক দিয়ে তারা বহুরূপী প্রভৃতি বহু লোকায়ত অভিনয়ের আত্মীয়।

মনে হয়, গোড়ায় অন্য দুই শ্রেণীর পুতুল-নাচের মতো এরাও মঞ্চাশ্রয়ী ছিল। কিন্তু পেটের টানে তারা সেই বন্ধন ভেঙে বেরিয়েছে, বাংলার বিবিধ লোকায়ত অনুষ্ঠান দেখে দেখে শিখে অন্য রীতি রপ্ত করেছে। পর্দার আড়ালে

থেকে শুধু হাত দুটি বের করে পুতুল-নাচানো—এর প্রয়োজনও তারা আর বোধ করেনি। এ দেশের মানুষ যদি কথকঠাকুরকে বিনা সাজে কখনো সীতা কখনো হনুমান বলে মেনে নিতে পারে তো নাচিয়ে-শিল্পীকে চোখে দেখলেও অস্বস্তিতে পড়বে না, তার হাতের পুতুলের কাজে মন নিবিষ্ট করবে, তাদেরই সত্য বলে ভাববে এবং সমসাময়িকভাবে হলেও সামনে বসে-থাকা শিল্পীর অস্তিত্বকে ভুলে যাবে। তাদের এই ভাবনা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দস্তানা পুতুল নাচিয়ে দর্শকের সামনে প্রকাশ্যে থেকে পুতুল নাচায়, শৈল্পিক-বিভ্রমে ব্যাঘাত ঘটে না।

দস্তানা-শিল্পীরা তাদের জনবল, আয়োজন-উপকরণের স্বল্পতা এবং প্রদর্শন-পরিবেশ-অনুযায়ী কালসংক্ষেপের কারণে[৪১] পালাগুলো ছোট আকারে বেঁধে থাকে। পৌরাণিক পালার একচেটিয়া আওতা থেকে এরা বাংলার পুতুল-নাচকে বাস্তবতায় বের করে এনেছে। ছোটখাটো নক্শাধর্মী লঘু পালা, অনুচ্চ সমাজ-ব্যঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে এদের কাজ।

দস্তানা-শিল্পীদের এই পথের ধারে এবং বাড়ি বাড়ি অনুষ্ঠান দেখিয়ে দেখিয়ে রোজগার করাকে যাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি মনে করেন, পুতুল-নাচ শিল্পীদের আর্থিক দুর্গতির চরম নিদর্শন বলে দুঃখ পান তাঁদের সঙ্গে আমার সামান্য মতদ্বৈধ আছে। বর্তমান বাংলার অন্য দু-শ্রেণীর পুতুল-নাচিয়েরাও কিছু কম গরিব নয়, দারিদ্র্যের জন্য এই শিল্প তো প্রায় উঠে যেতে বসেছে। দস্তানা-শিল্পীরা যদি দর্শকের দোরে গিয়ে আয় বাড়াবার চেষ্টা করে তবে তাদের ভিখারি বলা চলে না কিছুতেই। বাংলার বাউল-বৈরাগী গান শুনিয়ে ভিক্ষা চায়, বহুরূপী সিধে আদায় করে, কথক ঠাকুর প্রণামী, কবিয়াল প্যালা। সাংস্কৃতিক পণ্য বিক্রির এ-হল ভিন্ন ভিন্ন নাম। এবং এদের মঞ্চ ছেড়ে রাস্তায় নামা, বাড়িবাড়ি ঘোরা শিল্পরীতিটির অবক্ষয় সূচিত করে না—নতুনভাবে বাঁচবার, সংযোগের নব-নব সন্ধানের ইঙ্গিত দেয়।

● ৮. যদি রাধা না হইত

রাধা না হলে ভক্ত বৈষ্ণবদের কি দশা হত? জগতকে কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা এবং প্রেমরসের সীমা কে জানাত, শেখাত?

যারা ভক্ত বৈষ্ণব নয় এবং রাধাতত্ত্বে বিশ্বাসী বা আগ্রহী নয়, তাদেরও কিছু কম ক্ষতি হত না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশই রাধা-নির্ভর বৈষ্ণব রচনাবলী। এবং সেকালের বাংলার পারফরমিং আর্টের বহুবিচিত্র রূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাবান্দোলনকে আশ্রয় করেছিল। তার একটা মোটামুটি ফর্দ এখানে দিচ্ছি:

১. বৈরাগী-বোষ্টম রাধাকৃষ্ণ বা গৌর-নিতাইয়ের গান শুনিয়ে পথ চলে এবং বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা করে।

২. পথ-পরিক্রমার নানা অনুষ্ঠান :

২.১. বৈষ্ণব ভক্তেরা কৃষ্ণনাম গৌরনাম গান গেয়ে প্রভাতী নগর-সংকীর্তন করে।

২.২. বিভিন্ন বৈষ্ণব উৎসব উপলক্ষে নগর-কীর্তন হয়। কখনও তা বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন : দোলে।

২.৩. স্থান বিশেষে জন্মাষ্টমীতে সুসজ্জিত নয়নলোভন মিছিল বের হয়। ক্বচিৎ কোথাও রাস বা ঝুলনে। জগন্নাথের রথযাত্রাও বৈষ্ণব উৎসবই, এবং শুধু ওড়িশার নয়, বাংলারও।[৪২]

৩. নন্দোৎসব তালপিঠা খাওয়ার উৎসব। এর সংগে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কিছু ঘরোয়া আভিনয়িক রূপ পরিবেশনেরও রীতি আছে।

৪. ঝুলন বা রাস পূর্ণিমায় ঘরে ঘরে বালকদের উৎসাহে পুতুল সাজিয়ে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী হয়। বৈষ্ণব মন্দিরে-আখড়ায় এবং অনেক ধনী ভক্তের বাড়িতে সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

৫. বাংলার ঐতিহ্যবাহী তিন ধরনের নাচেই রাধাকৃষ্ণ লীলা অন্যতম প্রধান বিষয়।

৬. কথকতায় কৃষ্ণকথা একটি বড় অবলম্বন।

৭. দাশুরায় প্রভৃতির পাঁচালীতে একটি মুখ্য বিষয় হিসেবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা পরিবেশিত হয়।

৮. সারা বাংলা জুড়ে গোটা বছর ধরে নানা উপলক্ষে পালা-কীর্তনের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৯. কবিগানের মুখ্যবিষয় সখীসম্বাদ এবং বিরহ। দুটিই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার অংশ।

১০. পল্লীবাংলায় প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রা একটি অতি প্রাচীন পারফরমেন্স।

দেখা যাচ্ছে বাংলার লোকায়ত গীত-নৃত্য-নাট্য জাতীয় অনুষ্ঠানের সব না হলেও, অনেক বৈচিত্র্যই রাধা-কৃষ্ণ-গৌর-নিতাই প্রসঙ্গে অনুশীলিত!

উপরের তালিকার ১নং এবং ২/১-৩নং-এর বিষয় নিয়ে পরের উপ-অধ্যায়ে [শিরোনাম 'চলতে চলতে গান, পথে পথে নাটক'] কিছু বলব। ৫-৭নং প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা হয়েছে যথাক্রমে, 'পুতুলখেলা : ছোটদের, বড়দের', 'কথকতা'

এবং 'পাঁচালি-গান' শিরোনামে। এখন নন্দোৎসব, ঝুলনে বা রাসের পুতুল-প্রদর্শনী, পালাকীর্তন, কবিগান এবং কৃষ্ণযাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সংযোগের দিক থেকে তাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক।

৮.১ নন্দোৎসব

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে লৌকিক উৎসব। উৎসে বৈষ্ণব লোকাচার হয়ত ছিল, অথবা এমনও হতে পারে পাড়ায় কোনো শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে আটকৌড়েতে বালক জমায়েতে যে ধরনের আনন্দানুষ্ঠান প্রচলিত তার প্রভাবও এর গোড়ায় সক্রিয় ছিল। পরে তা নেহাৎ একটা গ্রামীণ পারিবারিক পারফরমেন্স হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে বালক-বালিকা এবং বাড়ির কিঞ্চিৎ বয়স্কা মেয়েদেরই ভূমিকা। নন্দ এবং সঙ্গী গোয়ালাদের সাজ সেজে, ছোট মাটির ভাঁড় যেন দইয়ের—এভাবে বাঁকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি তাদের নাচগান এবং রঙ্গকৌতুক। সঙ্গে ভোজ্যের যে ব্যবস্থা তাতে অবশ্য থাকা চাই তালের বড়া। প্রাসঙ্গিক জনপ্রিয় গানের ছড়া: 'তালের বড়া খাইয়া নন্দ নাচিতে লাগিল।'

বালকদের এই ঘরোয়া ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আয়োজন সেকালীন পল্লীজীবনের 'চিলড্রেনস্ লিটল থিয়েটার'—সাজপোশাক নাচগান হাস্যকৌতুক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ। গৃহস্থের অঙ্গনই রঙ্গমঞ্চ। অনুষ্ঠানের আগে-পরে তালের বড়া এবং শিশু কুশীলবদের প্রতি গৃহিনীদের আন্তরিক বাৎসল্য এর মধ্যে সহজ সংযোগের একটি গাঢ় মাত্রা এনেছে।

পেশাদার বহুরূপীর দলও নন্দোৎসবের পালা অভিনয় করে। তার আবেদন তথা সংযোগ রহস্য কিছু স্বতন্ত্র।

৮.২. ঝুলন বা রাসের পুতুল-প্রদর্শনী

ঝুলন বা রাস দুই-ই বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠান। পুজো-কীর্তনের সঙ্গে আখড়া-আশ্রমে এবং ধনী বৈষ্ণব গৃহে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী হয় পুতুল সাজিয়ে। ধর্মাচরণের সহযোগী হিসেবে এর উদ্ভব ঘটলেও তা ধর্মাচার ছাপিয়ে উঠেছে। পুজো-কীর্তনকে এড়িয়ে ঐ সব পুতুল প্রদর্শনী দর্শক আকর্ষণ করে আসছে। পুতনা বধ, বকরাক্ষস বধ বা রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের মতো কাহিনীগুলি এক বা একাধিক দৃশ্যে সাজানো থাকে। এগুলো ভগবানের লীলা হিসেবে ভক্তিরসাত্মক, কিন্তু সোজাসুজি চমকপ্রদ গল্প, কখনও বা অতিলৌকিকতাশ্রয়ী। ভক্তিভাবটি অনেকের ক্ষেত্রে গৌণভাবে মনের গভীরে থাকে, কিন্তু সকলের বেলায় শিল্পরস-তৃষ্ণা নিবৃত্তিই মুখ্য ব্যাপার।

মাটির পুতুল কুমোরদের তৈরি। খেলার পুতুল গড়ে যারা বা মণ্ডপের প্রতিমা—তারাই পেশাদারী দক্ষতায় এইসব দৃশ্য রূপায়িত করে। হয়ত গৃহস্বামী বা পাগড়ার গোস্বামীরা কিছু পরিকল্পনা যোগায়। কিন্তু রূপদান করে মৃৎ-শিল্পীরাই। রঙিন কাগজ, ন্যাকড়া, বাঁশ-কাঠের টুকরো দিয়ে দৃশ্যের সাজসজ্জাও করা হয় পেশাদারী নিপুণতায়।

কখনও বা একটি দৃশ্যে কাহিনী, কখনও একাধিক দৃশ্যে গল্পের বিকাশ। তখন স্থির খণ্ড দৃশ্যগুলি ক্রমিক বিন্যাসে গতির ভাব আনে। অনেকটা আধুনিক চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত মন্তাজ-এর মতো। চিত্র ও ভাস্কর্যে শিল্পতত্ত্বঘটিত যে সূক্ষ্ম পার্থক্য তা ঠিক জানা না থাকলেও সাধারণ দর্শকের মনেও ছবির সমতল এবং ভাস্কর্যের [এখানে মৃৎ ভাস্কর্য=পুতুল] ত্রিমাত্রিকতা ভিন্ন ধরনের স্বাদ নিয়ে আসে।

এই অনুষ্ঠানে গান নেই, শুধুই দৃশ্যময়তা। অডিও-ভিস্যুয়াল আবেদনের তুলনায় শুধু ভিস্যুয়ালে অপূর্ণতা থেকেই যায়। কিন্তু কৃষ্ণলীলা কথকতা-পদাবলীকীর্তন-কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতির পরিবেশে যারা মানুষ, এমনকি শহুরে এবং একেলে হলেও অন্তত বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত অধিকাংশের চিত্ত ঐ সব কাহিনী ও ভাবরসে এমনভাবে সিঞ্চিত যে নীরব দৃশ্যগুলিও যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

সব লোকায়ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরই কোনো শিশু সংস্করণ থাকে না। ঝুলন বা রাসের পুতুল প্রদর্শনীর কিন্তু আছে। এমন কি কলকাতা শহরের পুরনো পাড়ায় আজও এর প্রচলন।

ছোট ছেলেমেয়েদের পুতুলখেলার মতোই তাদের এই অন্যরকমের পুতুল-সাজানো। যদিও বড়দের অনুষ্ঠানের প্রভাবেই এর জন্ম। তাদের পুতুলগুলো মেলা থেকে কেনা—সাজানোর কাজকর্ম নিজেদের খুশিমাফিক তুচ্ছ উপকরণ-দিয়ে। পেশাদারী নিপুণতা নেই বলেই এই অনুষ্ঠান একান্তভাবেই ছোটদের। তারাই আয়োজক নির্মাতা এবং উপভোক্তা। পরস্পরের প্রতিযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সর্বদাই প্রাণবন্ত। বাড়ির পাড়ার বড়োরাও এই আনন্দ-উপভোগের অংশীদার হয়ে ওঠে—তাতে বাৎসল্যের স্পর্শ থাকে। ফলে আন্তরিক সংযোগের অন্য একটি মাত্রাও এক্ষেত্রে কার্যকর থাকে।

৮.৩. পালাকীর্তন

লীলাকীর্তন নামেই এদের পরিচিত করতে চান বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞ এবং কীর্তনীয়

খেতুরি উৎসবে গরাণহাটী কীর্তন রীতির প্রবর্তন করেন বৈষ্ণব আচার্য নরোত্তম। অন্যান্য প্রধান পদ্ধতি রেনেটি, মনোহরশাহী, মন্দারিণী। ঝাড়খণ্ডী ঠাটেরও উল্লেখ আছে। বেশিরভাগ বৈষ্ণব দর্শনে ও রসতত্ত্বে এবং ভারতীয় রাগসঙ্গীতে প্রাজ্ঞ সাধকেরা এগুলির ভিত্তি গড়ে যান। কীর্তন বিষয়ে যাঁরা গভীর চর্চা করেছেন যেমন খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গরাণহাটী কীর্তনকে ধ্রুপদের সংগে এবং মনোহরশাহীকে খেয়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হরেকৃষ্ণ রেনেটিকে ঠুংরির সদৃশ বলেছেন। খগেন্দ্রনাথ সব শ্রেণীর কীর্তনেই ঠুংরির ভাব লক্ষ্য করেছেন।

ফলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে এই অভি-অভিজাত তাত্ত্বিক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাবেদনের সম্পর্ক কোথায়? এ বিষয়ে প্রথমে বিশেষজ্ঞের[৪৩] বক্তব্য শোনা যাক :

১. অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন :

ক. কীর্তন বলিতে আমরা বাংলাদেশেরই একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত-পদ্ধতি বুঝি।

খ. …বাংলার বাহিরে আমাদের কীর্তন-সঙ্গীতের মত কোনও সঙ্গীত নাই। ভগবৎ-সঙ্গীত ভজন নামে অনেক স্থলে পরিচিত। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলার মাটিতে কীর্তন নামে যে এক অভিনব সঙ্গীত পদ্ধতি জন্মলাভ করিয়াছিল, অন্য কোনও দেশে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।[৪৪]

২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে :

ক. কীর্তনের অন্য একটি সুর মন্দারিণী, …রাঢ়ের প্রাচীন সুর, মঙ্গলকাব্যের গানের সুর। কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল এই সুরে গীত হয়। প্রাচীনকালে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলও এই সুরেই গাওয়া হইত, এখনও হয়।

খ. কীর্তনের আর একটি সুর আছে ঝাড়খণ্ডী। ইহাও রাঢ়ের প্রাচীন সুর, লোকসঙ্গীতের সুর মঙ্গলকাব্যের সুর।[৪৫]

৩. অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য :

বাংলার কীর্তন আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া রাগ-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি পল্লীগীতির সাধারণ সুরের স্তর হইতেই যে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। বাংলাদেশের বিশেষ একটি আঞ্চলিক পল্লীগীতিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমে বিশেষভাবে

অনুশীলন করা হইবার ফলে ইহা আজ রাগসঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত হইলেও ইহার লৌকিক একটি ধারা আজ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন অংশের পল্লী অঞ্চলে অব্যাহত আছে। তাহাকে লৌকিক কীর্তন বলিয়া অভিহিত করা যায়। লোকসঙ্গীতের বিশেষ একটি রূপ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পরিণত হইবার পরও ইহার লৌকিক রূপটি সমাজের মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া যায় না, তাহা নিজস্ব ক্রমবিকাশের একটি ধারা নিজেই রচনা করিয়া লইয়া সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে।[৪৬]

উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় :

১. কীর্তন খাঁটি মার্গসঙ্গীত নয়। এর উৎসে লোকগীতের ভিত্তি ছিল এবং এর বিবর্তনের পথেও লোকগীতের বিবিধ মাত্রার সম্পর্ক ঘটেছে।

২. কোনো কোনো শ্রেণীর কীর্তনে লোকগীতের সুরের প্রাধান্য।

৩. অভিজাত শ্রেণীগুলির বাইরে সমান্তরালভাবে লৌকিক কীর্তনের একাধিক ধারা প্রবাহিত।

এর ফলে কীর্তন জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র একটি আভিজাত্যে লালিত বৈঠকী সঙ্গীতের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। প্রকৃতপক্ষে কীর্তন কখনও মুষ্টিমেয়ের উপভোগের সামগ্রী হয়নি। অন্তরঙ্গের সঙ্গে রস-আস্বাদন এবং সকলের জন্য নামসংকীর্তন, খেতুরি উৎসব থেকে সেই ভেদ বজায় রাখা হয় নি। রসকীর্তনের আসরের অন্তর্বলয়ে যদি নাও হয় বহির্বলয়ে সর্বদাই আপামর সাধারণের উপস্থিতি ছিল।

কীর্তনের সব ইতিহাসকারেরাই শাস্ত্রীয় বিধি থেকে এর ক্রমিক স্খলন এবং জনপ্রিয়তার ক্রমিক ব্যাপ্তির কথা বলেছেন। সর্বসাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রান্ত থেকে সামনে এসে গিয়েছে বোঝা যায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ কীর্তনীয়া কোনো ভূস্বামীর সভাগায়ক ছিলেন না বলেই জনসভার গায়ক হওয়ার তাঁদের প্রয়োজন ছিল, কিছুটা ধর্মপ্রচারের জন্য, অনেকটাই উপার্জনের উদ্দেশ্যে।

ধর্মভাব এবং তার প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু শুধু পূর্ণ শক্তিমান কৃষ্ণ ও হ্লাদিনী শক্তি রাধার লীলাবিলাসে ভক্তের বিহ্বলতায় এর আবেদন সীমাবদ্ধ থাকত না। তাকে ছাপিয়ে যুবক কৃষ্ণের গোপবধূ রাধার সঙ্গে মানবিক প্রণয় বৈচিত্র্যের আস্বাদন বড় হয়ে উঠত। পালায় গ্রথিত রসকীর্তন বৈষ্ণবী সংস্কারের বাইরের, এমনকি মুসলমান সাধারণ গ্রামীণদেরও কিছু কম আকর্ষণ করত না। দোহার সহযোগে কীর্তনীয়া রাধা-কৃষ্ণ-বৃন্দা প্রভৃতি সখী ও দূতীদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার গান-পরিবেশনে একটা আভিনয়িক রীতির অনুসরণ

করত। নৃত্য সংবলিত হওয়ায় কিছুটা আঙ্গিক অভিনয়ের ভাবও সঞ্চারিত। ভূমিকানুযায়ী সাজসজ্জা না-করায় কিংবা একই কীর্তনীয়ার একাধিক ব্যক্তির গান গাওয়ার ফলে দর্শক-শ্রোতা সাধারণের শৈল্পিক বিভ্রমে কোনো ব্যত্যয় ঘটত না। কীর্তনীয়ারা এবং বাংলার এই গ্রামীণ উপভোক্তারা মঙ্গলগান-কথকতার পরিবেশন-রীতির মধ্যে মানুষ। কীর্তন সেই দীর্ঘকালীন অভ্যাসের পথ ধরেই গণসংযোগে সুস্থিত হতে পেরেছিল।

কীর্তনের রূপ ও রীতিঘটিত বদল অনেক ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে, আগের তুলনায় প্রভাব প্রসার কমেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে, ছোট শহর-গঞ্জে এবং কতকটা নগরে এর ভূমিকা এখনও কম-বেশি সক্রিয় আছে।

৮.৪. কবিগান

কবিগানকে পণ্ডিত ফোকলোরিস্টরা লোকসঙ্গীত বলে মানেন না। তা নিয়ে আমার কোনো তর্ক নেই। আমার আলোচনার চৌহদ্দীতে একে ঢুকিয়ে নিয়েছি মনে কোনো সংশয় না রেখে। এর পরিবেশনকারীরা প্রায়ই সাধারণ স্তরের অনভিজাত মানুষ এবং উপভোক্তাদের মধ্যে অশিক্ষিত জনতারই ভীড়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে, উনিশের শতকে প্রথম দিকে বাবুরা-ধনীরা কবিগানের আয়োজন করতেন। ক্রমে তা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে অমার্জিত ও পরিত্যজ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেকালে বা একালে এর উৎসাহী শ্রোতা ও পরিপোষক লোকসাধারণ।

সরল বুদ্ধির সাধারণকে তৃপ্ত করার সব উপকরণই এর মধ্যে ছিল। চটুল চতুর বাকবিন্যাসে রাধাকৃষ্ণ সখীদের প্রণয়দ্বন্দ্ব। চিরপরিচিত রাধাকৃষ্ণ আছে, বাঙালির রক্তমজ্জায় যুগযুগান্তর ধরে যার অবস্থান, কিন্তু ভক্তি নেই—নেহাৎই নরনারীর প্রেম। গভীরতার অভাব পূরণ হয়েছে একান্ত লৌকিকতার রঙে। দেবলোকের সব মহিমা, বৈষ্ণব গোস্বামী ও কীর্তনীয়াদের দার্শনিকতা ও তত্ত্ববোধ সরিয়ে একেবারে জীবনের কাছে চলে আসা, তার লঘুতা চটুলতা স্থূলতা নিয়ে। রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে বাঙালি আপামর সাধারণের অন্য এক ধরনের সংযোগ।

আমি এমন কথা বলতে চাই না, পদাবলী সাহিত্য ভক্তিরসাশ্রয়ী বলে তার গণসংযোগের সম্ভাবনা কিছু কম ছিল। সেখানে ভগবৎলীলায় নরনারীর মান-অভিমান সুখ-দুঃখ আন্দোলিত হতে দেখে মানুষ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে নিজেকেও

খানিকটা পেত, নিজের প্রেমের মধ্যে বড় কিছু অনুভব করতে পারত। সংযোগের এই এক মনস্তত্ত্ব। এরই একটা স্বতন্ত্র মাত্রা ঐ ঐতিহ্যবাহিত রাধাকৃষ্ণকে একেবারে নিজের সমতলে নামিয়ে আনায়।[৪৭]

কবিগান পরিবেশন বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির বহু পরীক্ষিত এবং প্রথানুগ বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসরণ করে চলেছে। চারদিকে শ্রোতা-দর্শকমণ্ডলী, মাঝখানে মাটির সমতলে আসর। উঁচু মঞ্চ পরের যুগে ক্বচিৎ কখনো দেখা যায়। অতি সাধারণ বাদ্যযন্ত্র এবং সুপরিচিত ঢোল-কাঁসি, মাঝে মধ্যে বাঁশির সহযোগ। দোহার সহ গায়েন। গানের সঙ্গে কিছু নাচ। গায়েনের পায়ে ঘুঙুর থাকে। দৃশ্যময়তার গুরুত্ব যেন সহজাতভাবে জানা ছিল এইসব পারফরমারদের, যাদের মূল কাজ শ্রুতিসর্বস্ব গান নিয়ে। 'অডিও-ভিস্যুয়াল' পদ্ধতি গণসংযোগের ক্ষেত্রে যে কত শক্তিমান গ্রামীণ শিল্পীরা তা গভীরভাবেই অনুধাবন করে থাকেন।

কবিগান প্রায়ই কবির লড়াই বা তরজার রূপ নিয়ে দেখা দেয়। একজন কবিগায়ক দোহারসহ সখীসম্বাদ গাইতে গিয়ে রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাদূতীর ভূমিকায় একাই গাইতেন। ক্বচিৎ ক্রুদ্ধ সংলাপ-সঙ্গীতে দোহারে-গায়েনে দুই পক্ষের বিভ্রম তৈরি হত। কাচ-কাচা অর্থাৎ সাজপোশাক ছাড়াই এও এক ধরনের অভিনয়। কিন্তু দুই দল কবির মুখোমুখি লড়াই অনেক উত্তেজক এবং অনেক নাটকীয় বলে ক্রমে তরজার জনপ্রিয়তা গেল বেড়ে।

তরজার আসরে বিষয়বস্তু সখীসম্বাদ-বিরহের প্রথাগত সীমা ছাড়িয়ে যেত প্রায়ই। পৌরাণিক হেঁয়ালী থেকে গায়ক-কবিদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে যেত। উত্তর-প্রত্যুত্তর কলহে পৌঁছত। একান্ত লৌকিক নিত্যকার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ নিয়েও গান বাঁধা হত। দাঁড়াকবিরা সঙ্গে সঙ্গে কবিতা বানিয়ে অন্যপক্ষের কথার জবাব যোগাতেন। দর্শক-শ্রোতার বিস্ময়ের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠত।

একদিকে এই উত্তেজনা-নাটকীয়তা-বিস্ময়ের আকর্ষণ, অন্যদিকে লৌকিক প্রণয়ের লঘু চটুলতা এবং জীবনের তুচ্ছ বাস্তবতা—এই দ্বিমুখী সূত্রে কবিগানের গণসংযোগের শক্তি আজও ফুরিয়ে যায়নি। বিশেষত এর মধ্যে বিষয়গত প্রসারণের যে সম্ভাবনা তা একে ভবিষ্যতের দিকে অনেকদূর নিয়ে যেতেও পারে।

৮.৫. কৃষ্ণযাত্রা

এখনকার যাত্রা থেকে ব্যাপারটা পৃথক ছিল। 'এখনকার' যাত্রা প্রায় কলকাতার পেশাদারী নাট্যাভিনয়ের সমানবয়সী। এর উদ্ভব ও বিকাশ বর্তমানে আমার

আলোচনার বিষয় নয়। প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করছি। 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা' নাম দিয়ে পুরনো যাত্রার সঙ্গে একে পৃথক করে চেনা যাবে। থিয়েট্রিকাল যাত্রার বাণিজ্যিক পেশাদারী নিপুণতা অবশ্য নাগরিক। শহরে ও গ্রামে এর সমান জনপ্রিয়তা। লৌকিক যাত্রার সঙ্গে এর অতীতে বেশি সম্পর্ক ছিল, এখনও তার সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে। এ-বিষয়ে নিচের নক্শাটিকে লক্ষ্য করা যাক:
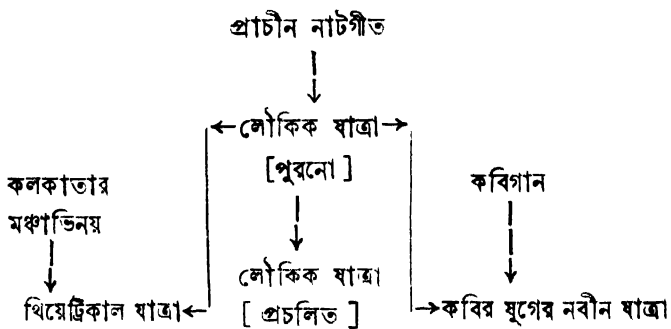
সূত্রাকারে এই নকশার প্রকাশিত বক্তব্য বিশদ করছি:

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যার কতক রূপ ধরা আছে সেই প্রাচীন নাটগীত থেকে লৌকিক স্তরে যে যাত্রাভিনয় সূচিত হয়েছিল তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি অনুমান সাপেক্ষ। সম্ভবত ঘটনা থাকত অল্পই, গানের সূত্রে বাঁধা। তিনটির বেশি চরিত্র নয়। বিষয় প্রধানত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। কাহিনী-বিচ্ছিন্ন স্থূল হাস্যবিতরণের জন্য থাকত নারদমুনির মতো দু-একটি পাত্রের আকস্মিক উপস্থিতি।

২. কবিগানের প্রাধান্যের সময়ে যাত্রার একটি নতুন রূপ দেখা দেয়। পুরনো লৌকিক রীতির কাঠামোয় কবিগানসুলভ সখীসম্বাদ-বিরহ ধরনের গান দিয়ে এর সংলাপ গড়ে উঠত।

৩. কলকাতায় পেশাদারী থিয়েটার গড়ে ওঠার সময় থেকে পাশাপাশি নতুন আর একটি অভিনয়কলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে,—যাত্রাভিনয়। সাধারণ নাটক, কিছু বাড়তি গান যোগ করে, খোলা মাঠে বা প্রাঙ্গনে, তিন বা চারদিক খোলা মঞ্চে অভিনয় করা হত। মঞ্চের সামনে-পিছনে পট থাকত না, উইংস নয়। রঙ্গশালায় বদ্ধ সীমাবদ্ধ দর্শকমণ্ডলী নয়। গানের বাড়াবাড়ি, খোলা রঙ্গালয়, পটহীন মঞ্চ এ-দুটো জিনিস লৌকিক যাত্রা থেকে, অন্যসব বিলিতি

রীতির থিয়েটার থেকে এসে জুটেছিল।

ক্রমে এই যাত্রা 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা' নামে পরিচিত হয়। এর জন্য পৃথক নাট্যরচনা শুরু হয়, কলকাতায় অনেকগুলি পেশাদার দল তৈরি হয়। কলকাতার সাধারণ মানুষের কাছেও এবং মফস্বলে গ্রামে এদের জনপ্রিয়তা থিয়েটারকে অনেকগুণ ছাড়িয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ হিন্দী-সিনেমার সঙ্গে এরা সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

থিয়েটারের তুলনায় এই যাত্রা-পালায় ঘটনাবিন্যাসে ভাষায় অভিনয়ে সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। সর্বত্র স্থূলতা, অমার্জিত আতিশয্য। রঙের উপরে রঙ ফলানো। আর একটি পার্থক্য হল দৃশ্যপটের অভাব।

৪. গ্রামে কিন্তু একটি স্বতন্ত্রজাতের কৃষ্ণযাত্রা অনেককাল ধরে চলে বর্তমানে প্রায় হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। পুরনো লৌকিক যাত্রার বংশে এর জন্ম। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার নানা পালা। যেমন, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন প্রভৃতি এরা খোলা আসরে অভিনয় করত। রাধাকৃষ্ণ এবং সখীর দলেরই প্রধান ভূমিকা। জটিলা-কুটিলা আয়ান ঘোষ মাঝে মাঝে থাকত। মোটা দাগের হাস্যের যোগানেই প্রায়শ এদের ভূমিকা নিঃশেষিত হত। আয়ানের লম্ফঝম্পও বীররসের বদলে হাস্যেরই কারণ হত। রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রণয়লীলার উল্লসিত স্বাদ প্রত্যক্ষত ভক্তিরস-সিঞ্চিত না হয়েও সামাজিক উপভোগে উদার স্বীকৃতি পেত। অবশ্য রাধা-কৃষ্ণাশ্রিত ধর্মীয় সিদ্ধপরিচয়ের পটভূমির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তবে এসব পালায় যেসব লোককবির গান সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত হত তাতে কোনো ভক্তির ব্যঞ্জনাই থাকত না। বড় বৈষ্ণব কবিদের জনপ্রিয় কোনো কোনো গান যখন ব্যবহৃত হত, তারও এতটা লোকায়ত রূপান্তর ঘটে যেত যে কীর্তনের ধর্মভাবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকত না। পদাবলীর পালা কীর্তনের সঙ্গে এদের বড় রকমের পার্থক্য। যতটা পার্থক্য ততটাই এদের গণ-নৈকট্য—জীবন-নৈকট্য গ্রামীণ সমাজে মুক্ত প্রণয়ের স্বপ্ন ও তৃষ্ণা এদের মধ্যে কিছু প্রতিফলিত হত।

এই লৌকিক কৃষ্ণযাত্রার সহজ গণগ্রাহ্যতা এবং ভক্তিবিমুখতা দেখেই কৃষ্ণ-কমল গোস্বামীর মতো ধর্মনিষ্ঠ দু-চারজন যাত্রাকার এর মধ্যে ভক্তিরস সঞ্চারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাত্রপাত্রীদের সংলাপে তাঁরা মহাজন পদাবলী—ভাঙা গান ব্যবহার করতে থাকেন; কখনও আবার কীর্তনীয়াদের মতো আখর দিয়ে বৈষ্ণবী-ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাও ঐসব গানের অঙ্গ হয়ে উঠত। ভক্তশ্রোতা দর্শকদের কাছে প্রিয় হলেও সাধারণ যাত্রারসপিপাসুদের আপন হয়ে উঠতে পারেনি এই

ধারা,—হলে এর আয়ু কিছু বৃদ্ধি পেত।

সে যাই হোক আমাদের আলোচ্য লৌকিক যাত্রা গ্রামের মানুষের বড় কাছের জিনিস ছিল। পুরোপুরি পোশাক ইত্যাদি পরে—যদিও ছেলেরাই মেয়ের ভূমিকা নিত, এগুলো ছিল পুরোদস্তুর গ্রামীণ থিয়েটার। গ্রামে গ্রামে গান ও অভিনয়-পাগল ছেলেরা এর অনুষ্ঠান করত, পেশা হিসেবে নয়, বিনোদনের—সৃষ্টির নেশায়। প্রায় সকলের পরিচিত অভিনেতা-গায়ক, জাঁকজমকের অভাব, উপকরণহীন আসর শ্রোতা-দর্শকের সমতলে। একেবারেই অপেশাদার ব্যাপার। তারপরে কিছু কিছু ছোট ছোট গ্রামীণ যাত্রাপার্টিও গড়ে উঠেছিল, যারা অংশত পেশাদারী পরিবেশনও করত।

কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-রাধাপ্রসঙ্গ এত বিচিত্র রূপ নিয়ে সেকালে বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যাতে তা ধর্মসংশ্লিষ্ট এবং ধর্ম-বিবিক্ত চিত্ত-বিনোদনে এর বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। আজও গ্রামজীবনে, অল্পশিক্ষিত-অশিক্ষিত বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে এর অনেক অবশেষ সক্রিয় রয়েছে।

● ৯. দেবগণের মর্ত্যে আগমন

বাংলা যাত্রা-নাটকে পৌরাণিক বিষয়ের বাড়াবাড়ি। একালেও অন্তত যাত্রা থেকে তার প্রতিপত্তি কমেনি। সেখানে ঝকমকে পোশাকে দেবতা এবং দেবকল্প মানুষের ভীড়। কিন্তু প্রায় পুরোপুরি দেবগণের মর্ত্যে আগমন দেখতে গেলে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে চলে আসতে হবে। রাতভোর অনুষ্ঠানের সঙ্গী হতে হবে। রবীন্দ্রসদন-কলামন্দিরে বাছাই ছৌ-দলের আয়োজন দেখে পুরো সত্তা ধরা যাবে না। অরণ্য-পর্বত ঘেরা শুকনো কর্কশ মাটিতে, আদিবাসী-বাঙালি-দেহাতী-ওড়িয়া-বিহারীদের বাসভূমিতে এর উদ্ভব এবং বৃদ্ধি। শহুরে মানুষের চোখে পড়ে, বিদেশ ঘোরার সুবাদে, দিল্লীর উৎসবে আমন্ত্রণ পেয়ে এর রূপে-স্বভাবে কিছু মাজা-ঘষা। তা সত্ত্বেও এখনও এর গোড়াকার বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়ে যায়নি, অনেকটাই প্রত্যক্ষ আছে, কিছু অনুমান করে নিতে হয়। যথাযোগ্য পরিবেশে পরিস্থিতিতে এই মূক নৃত্যাভিনয় বারবার দেখার সুযোগ পেলেই শুধু এর মর্মে পৌছান যায়।

এখন গ্রামীণ যাত্রাপার্টির মতো পুরুলিয়ায় ছৌ-নাচের অনেক দল তৈরি হয়েছে, যাদের ভাড়া করে মফস্বল শহর গঞ্জ ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে নানা সামাজিক-পারিবারিক উৎসবে পালা দেওয়া হয়। এই সব দলে কিছু মহলার ব্যবস্থাও

থাকে। অবশ্য ছৌ-নাচে ব্যক্তিগত নৃত্য কৌশল আয়ত্তের জন্য যেমন, তেমনি দলগত শৃঙ্খলায় কাহিনীর সঠিক পরিবেশনের জন্যও রীতিমতো অভ্যাস-অনুশীলনের প্রয়োজন। যে কেউ ইচ্ছা করলেই বা রিচুয়াল-মাফিক নাচে যোগ দিল—এমন লৌকিক অনুষ্ঠানের পর্যায়ে একে ফেলা যায় না। সে যা-ই হোক ছৌ-পার্টিগুলিকে কেন্দ্র করে সঠিক পেশাদারী পরিমণ্ডল কিন্তু গড়ে ওঠে নি। এগুলো প্রায়ই মরশুমি সাময়িক কাজ, কিছু রোজগারও হয়ত হয়, কিন্তু পুরো জীবিকা হিসেবে এদের আশ্রয় করা হয় না। ফলে এদের লোক-চরিত্র এখনও কিছু বজায় আছে।

ছৌ-নাচ বলতেই বাংলায় আমরা বুঝি 'পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ'।[৪৮] গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শহরের সাংস্কৃতিক মনোযোগ আকর্ষণ করলেও আজও তা আঞ্চলিকতায় অবিচল আছে। ছৌ-নাচের প্রাচীন গ্রামীণ লোকায়ত বৈশিষ্ট্য বেশ কতকটা এখনও বর্তমান। সারা দেশে অনেকখানি পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ছৌ-নাচের চর্চা বা দল বাঁধার চেষ্টা অন্যত্র ঘটেনি। অন্যদিকে এর মধ্যে আধুনিক রাজনৈতিক-সামাজিক বক্তব্য আমদানির অভিপ্রায় এখন পর্যন্ত বহিরাগতই থেকে গিয়েছে, তার রক্তমজ্জা হয়ে উঠতে পারেনি। প্রচলিত যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে এখানে তার মূল পার্থক্য।[৪৯]

নিজ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ বলেই ছৌ-নাচের মধ্যে গণসংযোগের এমন কিছু শক্তির পরিচয় এখনও পাঠ করা যায়,—তার পুরো তাৎপর্য পুরুলিয়ার রুক্ষ পাথুরে জমি, পাহাড়-জঙ্গল, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়েই। একথাও সত্য ঐ আঞ্চলিক-ভৌগোলিক চরিত্র সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে লোকায়ত সংযোগের অনেকগুলি মাত্রা ধরিয়ে দেয় যা সর্বজনীন এবং সর্বস্থানিক।

সংক্ষেপে এবং সূত্রাকারে সে-সব আঞ্চলিক এবং অঞ্চল-ডিঙোনো সংযোগ-শক্তির বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যাক।

১. দেহের ভাষা॥ ছৌ-নাচ একটি পুরোপুরি মূক নৃত্যাভিনয়। কখনো কখনো ছন্দোবদ্ধ সংক্ষিপ্ত গানে নাচ আরম্ভ হবার আগে গল্পের রূপরেখাটি ধরিয়ে দেওয়া হয়। মনে হয় এটি আধুনিক সংযোজন। রামায়ণ-মহাভারতের যে-সব ঘটনা ছৌ-নাচের অবলম্বন তা প্রায় সকলেরই পরিচিত। ঐ ধরনের সংক্ষিপ্ত ও বিবর্ণ বিবরণে তার পরিবেশনা কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করতে পারে না। এই কারণেই মূল অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঐ প্রারম্ভিক গানটিকে গ্রহণ করা যায় না। ছৌ-নাচ শুরু হলে তার সঙ্গে কোনো গান বা সংলাপ থাকে না। বলা

যেতে পারে পাত্রপাত্রীদের মুখ থাকে মুখোসে আঁটা—সংলাপ বলার বা গান গাইবার সুযোগ তাদের থাকে না। কিন্তু পেছন থেকে অন্যে গান গেয়ে সে অসুবিধা দূর করতে পারত, পুতুল নাচে যেমন হয়। কাজেই মুখোসের জন্য মূলত নয়, অন্য গুরুতর কারণে এই 'সম্পূর্ণ মূকাভিনয়' পরিকল্পিত হয়েছিল।

১.১. একটি কারণ আঞ্চলিক-ভৌগোলিক। পুরুলিয়ার এই অঞ্চলের মানুষ বাংলা, দেহাতী বিহারী, সাঁওতালি-মুণ্ডারি প্রভৃতি ভাষাভাষী। তাদের মধ্যেই এই নৃত্যাভিনয়ের জন্ম এবং বৃদ্ধি। তারাই এর ধারক এবং উপভোক্তা।[৫০] হয়ত বিচিত্রভাষী লোকেদের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার খোঁজে ছৌ-নাচ থেকে ভাষা ব্যাপারটাই বাদ পড়ে গিয়েছিল। ভাষাকে অস্বীকার করে এরা ঘোচাতে চেয়েছিল ভাষার সীমাবদ্ধতা।

১.২. ভাষাকে বাদ দেওয়া কিন্তু একটা নেতিবাচক কাজ। মূক নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে তারা আবিষ্কার করল দেহের ভাষাকে। যে-কোনো নৃত্য দেহের ভাষাকে অল্পাধিক ব্যবহার করে। ভাষাধৃত সঙ্গীত বা আবৃত্তিকে এড়িয়ে গিয়ে ছৌ-নাচ শরীরী আবেদনকে সর্বস্ব করে তুলল। ধামসা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তার সহযোগিতা করল। কানের কাজ পুরোই চোখের অধীন, চোখেই সমর্পিত। পশ্চিমের আধুনিক নাটকে ফিজিকাল 'অ্যাক্টিং' নামে যে রীতি নিয়ে অনেক আলোচনা-বিতর্ক[৫১], প্রত্যন্ত বাংলার সাধারণ মানুষদের এই নাট্যানুষ্ঠানে, নাট্য তো বটেই তার সমধর্মী কিছু দেখা যাবে।

ভাষা গণসংযোগের অতি শক্তিশালী বাহন। জীবনে এবং বিচিত্র সাংস্কৃতিক আয়োজনে—সাহিত্যে ভিস্যুয়াল তথা পারফরমিং শিল্পে ভাষা স্থূল-সূক্ষ্ম নানা-ভাবে, বহুবিধ মাত্রায় সংযোগের দায়িত্ব পালন করে আসছে। অর্থযোগে, অর্থ-ভেদে, ধ্বনির আমেজে, ব্যঞ্জনায়, ভাবানুষঙ্গে, ইন্দ্রিয়াবেদনের বৈচিত্র্যে তথা বিপর্যয়ে শব্দের শক্তি যে কত ব্যাপক, সাহিত্যাদির চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা তা ভালোভাবেই নির্দেশ করে থাকেন। তবুও মেনে নিতেই হয়, ভাষার সংযোগ-ক্ষমতার নানাদিকে বন্ধনও অনেক। এর সূক্ষ্ম-গভীর-জটিল আবেদন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও মননশীল মানুষের বাইরে পৌঁছয় না। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ দৃশ্যময়তা নেই, পরোক্ষত তার সক্রিয়তা শ্রুতির মধ্য দিয়ে। দৃশ্যময়তাকে শুধু প্রত্যক্ষ নয় সর্বস্ব করে, নৃত্যের ভঙ্গিতে এক শরীরী ভাষা তৈরি হয়। এখানেই নিহিত ছৌ-নাচের সরাসরি গণসংযোগের প্রচণ্ড শক্তি।

২. মুখোস। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের সঙ্গে মুখোসের ব্যবহার অচ্ছেদ্য।

শুধু একটা বিশেষ 'নৃত্য' হিসেবে দেখে ছন্দতাল-অঙ্গভঙ্গির উপরে গুরুত্ব দিয়ে মুখোস অপরিহার্য কি-না সে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সম্প্রতি মুখোসহীন ছৌ-নাচের দু একটি পালা প্রযোজিতও হয়েছে। বহির্বঙ্গে কোনো-কোনো ধরনের ছৌ-নাচে মুখোস থাকে না।

কিন্তু পুরুলিয়া ছৌ মুখোস ছাড়া চলবে না। আদিতে কোনো সময়ে এর মুখোসহীন অবস্থা ছিল কিনা সে গবেষণাও অবান্তর। লোকসংস্কৃতি প্রবহমানতায় অনেক কিছু ছেড়ে আসে, অনেক নতুন নিয়েও নেয়। আর ছৌ-নাচ তো শুধু বিশেষ ধরনের নাচ নয়, একটা সামগ্রিক পরিবেশনা। মুখোস-পোশাক-রঙ্গস্থল-বাদ্যসহযোগেদর্শক-সমাবেশ—সব নিয়ে এর রূপ। পুরুলিয়ার ছৌ-এর এক প্রধান আকর্ষণ ঐ মুখোস ও সংশ্লিষ্ট মস্তকাভরণের জাঁকজমক।

সবাই একথা জানেন ঐ অঞ্চলের চোড়দা গ্রামে এই মুখোস-তৈরির শিল্প একটা পেশাদারী কারু-শিল্প হয়ে উঠেছে, ছৌ-নাচ যতটা পেশাদারী তার চেয়ে বেশি।

এই মুখোসের প্রধান বৈশিষ্ট্য মন্দিরে মণ্ডপে বা অন্য পূজাস্থলে মাটির দেব-দেবীর যে মূর্তি গড়া হয়, তার সঙ্গে এর হুবহু সাদৃশ্য। আর দেবকল্প মানবগণের রামায়ণ-মহাভারতের মহাবীরদের মুখোসও দেবতাদের আদলেই তৈরি। দেব-দেবীর মূর্তির সঙ্গে যে সব অসুর দানব গড়া হয় পূজার জন্য, যেমন দুর্গাপ্রতিমার কাঠামোয় দলিত মহিষাসুর বা কালীপ্রতিমার কণ্ঠের মালায়, হাতের মুঠিতে ধরা শুম্ভ-নিশুম্ভ বা অন্য দানবদের ছিন্নমুণ্ড, সেইসব দানব রাক্ষসের সাদৃশ্যে তৈরি পৌরাণিক দানবদের বিচিত্র মুখোস। এইসব মুখোসধারী দেবদানব এবং দেবকল্প পৌরাণিক বীরের দল যেন পুজোয় মন্দির-মণ্ডপ ছেড়ে রঙ্গস্থলে এসে দাঁড়ায়। দেবগণের মর্ত্যে আগমন ঘটে। কোনো যাত্রাপালার কোনো দেবচরিত্রের থেকে এরা অনেক বেশি দেবতা শুধু ঐ মুখোসের গুণে।

সেই দেবতা, দানবেরা মণ্ডপ ছেড়ে নেমে এসেছে গ্রামবাসী দর্শকের ভীড়ের মধ্যে—একেবারে সমতলে, মাটির উপরে। গণসংযোগের দিক থেকে এর মধ্যে নিহিত তাৎপর্যগুলি লক্ষ্য করা যাক।

২.১. দেবতা-দানব-পৌরাণিক বীরেদের এই অতি নৈকট্য [নাট্যাভিনয়ের মতো প্রসেনিয়াম ব্যাপারটি একেবারে না-থাকায় এটা এত বেশি সত্য] সংযোগের নিবিড়তা ঘটায়।

২.২. মুখোসে দেবতাদির ভাব হুবহু অনুসরণে ভয়-ভক্তির একটা বোধ

দর্শককে কি দূরে ঠেলে দেয় না? আসলে ভয়-ভক্তির মধ্যে দিয়েও সংযোগই ঘটে, বিচ্ছিন্নতা নয়। শুনেই কথাটা উল্টো মনে হলেও এটাই সত্য:

সহজবোধে—নৈকট্য—ফল→সংযোগ,

দূরত্ব—ফল→বিচ্ছিন্নতা।

কিন্তু, দূরত্ব←কারণ—ভয়—ফল→সংযোগ।

ভয়-ভক্তি ও প্রীতির মতোই মানবচিত্তের একটি বন্ধনসূত্র। ভয় ও ভক্তি, এমন কি শুধু ভয় বা বিস্ময় বাস্তবত দূরত্বের কারণ হলেও মনস্তত্ত্বগতভাবে যেমন আকর্ষক তেমনি শিল্পগতভাবেও মনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

২.৩. মুখোসধারী দেব-দানব-বীরেরা দর্শকদের মতো সাধারণ লোক। কারুর কারুর সঙ্গে মাঠে-হাটে দেখা হয়, আছে চেনা জানা। এ-কারণে পরিচিতি-জনিত সহজ সংযোগ।

২.৪. মুখোস পরলেই শিল্পীর সঙ্গে সেই দেবতা ইত্যাদির অভিন্নতা [সাময়িক] ঘটে যায়। ব্যক্তিত্বের এই রূপান্তরে মুখোসের যাদুশক্তি আদিম বিশ্বাসের স্তর থেকে একালের যৌথ-অবচেতনাকে অন্তত কিছুটা আশ্রয় করে আছে। দর্শক তাই তারই মতো বা তারই পরিচিত এক অভিনেতা-নর্তকের সঙ্গে দুর্গা বা শিবকে অভিন্ন করে ফেলে। এখানেও ভয়-ভক্তি জনিত আপাত দূরত্ব কিন্তু আসলে সংযোগের এক জটিল প্রক্রিয়া।

৩. আসর ॥ ছৌ-নাচের আসর যে-কোনো লোকায়ত অনুষ্ঠানের মতো দর্শক-সমাবেশের মধ্যে সমতলে-মাটিতে। দর্শকদের মধ্য দিয়ে সরু পথ ধরে, যেন ভীড় ঠেলেই শিল্পীরা রঙ্গস্থলে আসে-যায়। ছৌ-নাচে একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। আসরে সতরঞ্চ জাতীয় কিছু পাতাও থাকে না। একেবারে মাটির উপরেই নৃত্যাভিনয়। মাটির সঙ্গে এই সম্পর্কটি মনে হয় নিরীহ, কিন্তু মাটির কাছের মানুষদের কাছে গভীর তাৎপর্যবহ।

৪. আদিম স্মৃতির টানে ॥ ছৌ-নাচের নৃত্যভঙ্গীতে, যন্ত্রসংগীতে, কচিৎ বিষয়েও এমন কিছু আছে যা এই নাচের ধারক-উপভোক্তাদের অতি প্রাচীন জাতীয় স্মৃতির অংশ বলে মনে হয়।

৪.১. ছৌ-নাচের বিষয় প্রধানত পুরাণাশ্রয়ী হলেও সর্বদাই যুদ্ধকে গুরুত্ব দেয়। গল্প যা-ই হোক নানাভাবে যুদ্ধ-দৃশ্য পরিবেশনই এই নৃত্য-নাট্যগুলির লক্ষ্য। এটা কোনো প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়, একটি মূল ধর্ম। বাংলার অতি প্রাচীন

ডোম সেনাদের কথা লৌকিক ছড়ায়, ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে। অন্ত্যজশ্রেণীর যে-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই নাচের উদ্ভব ও বৃদ্ধি তারা কি প্রাচীন ভূস্বামীদের সেনাবাহিনীতে অবস্থানগত সেই বীরত্ব-মহিমার স্মৃতি ধরে রেখেছে এই নৃত্যভঙ্গীতে ?

৪.২. ছৌ-নাচের 'কিরাতার্জুন' পালাটি বিশেষ জনপ্রিয় বলে মনে হয়। নানাদলের নৃত্যাভিনয়ে বারবার এই পালা পরিবেশিত হতে দেখেছি।

কিরাতরূপী শিব আসলে শিকারজীবী আদিবাসী-গিরিবাসী সমাজের প্রতিনিধি। অর্জুন বনে বহিরাগত, ধনী ও অভিজাত। বনের শিকার করা বরাহ দাবি করা যেন ব্যাধ সম্প্রদায়ের অরণ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ। এই পৌরাণিক কাহিনীতে অযোধ্যাপাহাড় ও সন্নিহিত অঞ্চলের লোকেরা তাদের বাস্তব অর্থনৈতিক জীবনের, বিশেষ করে তার অতীতের প্রতিফলন সহজেই অনুভব করেছে। হয়ত অতি প্রাচীনকালে একই সমাজ-বাস্তবতা আশ্রয় করে এই কাহিনীটি গড়ে উঠেছিল।

এ-বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে একটি বিশেষ পালায় এভাবে অর্থনৈতিক অধিকার-দ্বন্দ্বের আবিষ্কার অনেকটাই মনগড়া। একথা ঠিক ছৌ-নাচের অন্য কোনো পালাকে ঠিক এভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। তা ছাড়া প্রসঙ্গটি পুরাণ থেকে পাওয়া, পুরুলিয়ার লোকেদের নিজস্ব রচনা নয়। তবে ময়ূর ও বরাহ শিকারের দু-একটি বিচ্ছিন্ন [গল্প নেই] নৃত্যদৃশ্য ছৌ নাচের বিষয় তালিকায় দেখা যায়। এগুলি এদের নিজস্ব ব্যাপার, পুরাণের ঋণ নয়। এদের জীবিকায় শিকারের ভূমিকার কথা ওইসব নৃত্যদৃশ্য মনে করিয়ে দেয়।

আরও একটি কথা, ছৌ-নাচের প্রধান বাদ্য সহযোগ, ধামসা ঢোলের ধ্বনিতে অরণ্যে-পর্বতে মেঘাড়ম্বরের শব্দ মন্দ্রিত হতে থাকে।

৪.৩. ছৌ-নাচের নৃত্যভঙ্গীর দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য : ১. 'উলফা', অর্থাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠে ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে পড়া-শুয়ে পড়া নয়, প্রায়ই হাঁটু গেড়ে পড়া। ২. দেহের ঊর্ধাংগ কাঁধ এবং মাথা ঝাঁকানো ডাইনে বাঁয়ে ঘোরানো,—এর কোনো পারিভাষিক নাম আমার জানা নেই। এই দুটি নৃত্যভঙ্গী পালা বা চরিত্রের উপরে নির্ভর করে না। সব পাত্রীপাত্রী সব রকমের পালার নাচে এরূপ ভঙ্গী করবে। এর থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয়, এইগুলি ছৌ-নাচের আদিরূপ—প্রাণস্বরূপ। পৌরাণিক পালার হিন্দুয়ানী ছৌ-নাচের অবিচ্ছেদ্য

আশ্রয় হয়ে ওঠার আগে অরণ্য-পর্বতবাসী মানুষের সহজাত নৃত্যরীতি।

এগুলি কি যুদ্ধনৃত্যের ভঙ্গীরূপে অনুশীলিত হত? বীররসাত্মক আবেদন এদের আছে, তাই এ-ভাবনা ভিত্তিহীন নয়। তবে অন্যভাবেও ব্যাপারটি দেখা যেতে পারে। আমি 'যুদ্ধনৃত্যে'র অনুমানটি খণ্ডন করছি না, কিন্তু আমার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে, যা আরও বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করি।

৪.৩.১. শূন্যে লাফিয়ে অনাবৃত মাটিতে পড়া—এই নৃত্যভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি মাটিতে লাঙলচষা, বীজ বোনা, ফসলকাটা—প্রভৃতি কৃষিকর্মের সদৃশ একটা আবয়বিক রূপের আভাস দেয়। পুরুলিয়ার পাথুরে কঠিন মাটিতে এই কাজে দেবতার আশীর্বাদ ও পৌরাণিক বীরদের নৈপুণ্যের প্রয়োজন। মুখোস ধারণে কি এরা নিজেদের মধ্যে দেবতা ও বীরদের সঙ্গে অভিন্নতা সৃষ্টির যাদুতে বিশ্বাস প্রকাশ করত?

৪.৩.২. বাহু-ঘাড-কাঁধ-মাথার সঞ্চালনের ভঙ্গীতে কি রৌদ্রদগ্ধ খরাপ্রবণ অঞ্চলে, ঝড-বৃষ্টির আগমনে অরণ্য-শীর্ষের আন্দোলনের প্রতীক-দ্যোতনা?

বনবাসী স্থানিক মানুষের কৃষিজীবনে উত্তরণের যে আদিম সাধনা, ছৌ-নাচের উৎসে তারই স্মৃতি—এর গণসংযোগ সে কারণেই এত গভীর ও সত্য।

●১০. খাওয়া যখন উৎসব

নিমন্ত্রণ করে লোক-খাওয়ানোয় এক ধরনের গণসংযোগ ঘটে, যদিও আজকাল শহরে উপকরণবাহুল্য তাব অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে। আগে গ্রামে-মফস্বলে পুজো-পার্বণে, বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশনে হয়ত সারা পাড়া জুড়ে কিংবা পরিবারে-পরিবারে যে সংযোগ ঘটত তাতে খাওয়া-খাওয়ানোর খুশি একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের মেজাজে লিখেছিলেন: 'জেনো বাসনার সেরা বাসা রসনায়।'[৫২]

উৎসবের ভোজ প্রভৃতির উৎসে আদিম যৌথ-জীবনযাত্রার স্মৃতি,—কিছুকাল আগে পর্যন্ত সে-সত্য অনুভব করা যেত। আমার আনন্দ সকলের হোক। উপলক্ষটা ব্যক্তিগত লাভের সুখের স্বার্থের—উৎসব ব্যক্তিস্বার্থকে প্রীতি মৈত্রীতে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।[৫৩] ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য একজন মানুষকে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আমাদের সেকালীন সমাজ উৎসবে-যৌথভোজে এবং আরও অজস্র উপায়ে তার প্রতিষেধের ব্যবস্থা করেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার যে আয়োজন প্রাত্যহিক তা জীবন ধারণের, কিন্তু উৎসব বা রিচ্যুয়াল হিসেবে যে ভোজ তাতে মানস-সংযোগের ভূমিকা থাকে। তাকে পারফরমেন্সের মধ্যে ধরা যায় না ঠিকই কিন্তু সাংস্কৃতিক আচরণের বাইরেও রাখা চলে না। গ্রামজীবনে পুজো-পার্বণের সঙ্গে জড়িয়ে এবং পুজো-পাবণ নিরপেক্ষ খাওয়া-দাওয়ার 'বাড়তি' [বাড়তি বলতে ক্ষুন্নিবৃত্তি থেকে পৃথক কিছু] ব্যাপারও বড় কম ছিল না। নন্দোৎসবে তালের বড়া, বৈশাখে ঘটা করে কাসন্দ তৈরি, বিয়ের সূচনায় আনন্দনাড়ু, নবজাতকের কল্যাণে আটকৌড়ে, ভাদ্র মাসে চালগুঁড়ো-নারকেল-আখের গুড়ে তৈরি 'ভদুয়া', ঐ মাসের অমাবস্যায় রুটি-লুচি [যেসব অঞ্চলে দুবেলা ভাত অপরিহার্য আহার্য], চৈত-সংক্রান্তিতে চিঁড়ে-মুড়ি-খইয়ের মোয়া, পৌষপার্বণে পিঠে-পুলি যার মধ্যে অবশ্য থাক। চাই চালের গুঁড়োয় তৈরি আসকে বা চিতে পিঠে। পৌষপার্বণের ঢেঁকিতে চালকুটে গুঁড়ো করা। ইতুপুজোয় ছোট মেয়েদের নিজেদের হাতে উঠোনে আলুসেদ্ধ ভাত রেঁধে খাওয়া। বিজয়ার মিষ্টির দামী মেনুও অপূর্ণ থাকত, ঘরে তৈরি নারকেল নাড়ু ছাড়া। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনি খাওয়াদাওয়ার বিচিত্র ব্যবস্থা ছিল। তার বিস্তৃত পরিচয়, বর্গীকরণ এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আজও লোক-সংস্কৃতির কোনো গবেষক করেছেন বলে আমার জানা নেই। করলে ভালো হত। এর অনেকগুলো আজ লুপ্ত, অনেকগুলো এত বদলেছে যাতে সামাজিক সম্পর্কের সূত্র আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কখনও এইসব খাবার তৈরির প্রক্রিয়া হয়ে উঠত মেয়েদের মজলিস। ঢেঁকিতে চাল কুটতে প্রতিবেশী মেয়েদের ভিড়। কাসন্দ তৈরির শুরুতে তেল সিঁদুর উলুধ্বনিযোগে মেয়েলি রিচ্যুয়াল। কার বাড়িতে কি রকম কি হবে অথবা কি রকম কি হয়েছে তার আলোচনা। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। এ-বাড়ি সে-বাড়ি এক বাটি পিঠে-পায়েস, এক থালা নাড়ু-মোয়া দেওয়া-নেওয়া, যা অনেকটাই প্রতীকী। পরিবারে-পরিবারে একই দিনে বিশেষ রকমের একই জিনিস খাওয়ার ফলে এক ধরনের সহানুভূতি যাদু [সিমপ্যাথেটিক ম্যাজিক]। এভাবেই সংযোগ গড়ে ওঠে। বছরের পর বছর এই আত্মীয়তা ঘনীভূত হতে থাকে। ভজনানন্দ নাকি স্বর্গীয়, কিন্তু এই ভোজনানন্দ মাটির পৃথিবীকে স্বর্গাদপি গরীয়সী করে রাখত এই বাংলায়। বলা যেতে পারে এই ঘনিষ্ঠতা ছোট ছোট বৃত্তে। কিন্তু তা গাঢ়। এবং অনেক ছোট বৃত্ত পরস্পর লগ্ন হয়ে বাঙালি জাতিকে প্রায় আয়ত্ত করে ফেলেছিল।

এখানে আমি দুটি উৎসবের কথা বিশেষ করে বলতে চাই।

১০.১. পিঠেপার্বণে মাটি-ঘর-উঠোন

পৌষপার্বণে সবচেয়ে গরিব ঘরেও চালের আসকে বা চিতে পিঠে হতই। তারপরে পায়েসপুলি সাধ্যমতো। উৎসবের শুরুতেই বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের একটা কৃত্য থাকত। প্রথম খোলার পিঠেগুলো নিয়ে তারা মাটিতে পুঁতে দিত—ঘরের খাটালে অর্থাৎ মেঝের মাঝবরাবর, অধিকাংশ বাড়ির ভিতই মাটির তো, বাড়ির চতুঃসীমায় আনাচে-কানাচে, উঠোনের মধ্যিখানে।[৫৪] যেন বলা হল, বাৎসরিক উৎসবের বহুপ্রত্যাশিত খাদ্যের অগ্রভাগ তোমাদের দিলাম ঘর-বাড়ি-উঠোন-মাটি। পৌষের পিঠের সঙ্গে মাটিতে ভালোবাসা বপন করে বালক। পৃথিবীতে সে নতুন এসেছে, এ ভাবেই গড়ে ওঠে তার শিকড়ের নিবিড় বন্ধন।

১০.২. নবান্নের কাক

'হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়' ;

—জীবনানন্দ দাশ।[৫৫]

কবি নবান্নের কাক হয়ে বাংলার গ্রামে নবজন্ম পেতে চেয়েছিলেন। এই কাকটি এককালে পুববাংলার গ্রামে পরিচিত ছিল।[৫৬]

নবান্ন বছরের নতুন চাল খাবার উৎসব। উৎসবের দিন সকালে কার্তিক-অঘ্রানের কুয়াশা-ঢাকা ভোরে, সূর্য উঠবার আগে ছেলেমেয়েরা চাদর-দোলাই চাপা দিয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে গাছগাছালির মধ্যে কাকেদের নিমন্ত্রণ করতে লেগে যেত। উঁচু গলায় সুর তুলে ছড়া বলত :

ও কাউয়া কো কো কো
মোগো বাড়ি শুভ নবান্নো
আইও বইও চালকলা খাইও—

এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে এই নিমন্ত্রণের ছড়া উচ্চারিত হত—নবান্নের ঘুম ভাঙানো গান কাকের আমন্ত্রণে।

তারপরে লক্ষ্মীপুজোর পরে চালের গুঁড়ো-খেজুরগুড়-নারকেল জলে নবান্ন তৈরি হত। আর প্রথমেই কলার খোলায় করে বাচ্চারা সেই নবান্ন একটি কলা সহযোগে দিয়ে আসত গাছতলায় ঘেরা বাড়ির কানাচে। নিজেরা আড়ালে সরে অপেক্ষা করত। একটি দাঁড়কাক [পাতিকাক হলে চলবে না] এসে উড়ে বসত,

নবান্ন ঠুকরে খেত, কলাটি ঠোঁটে নিয়ে ডানা মেলে উড়ে যেত— তবে ছেলেদের শান্তি। তাদের হৈ হৈ করে ঘরে ফিরে নবান্ন ভোজে বসে-যাওয়া।

বেছে বেছে কাক কেন হল বলা মুশকিল। যমবুড়ির ব্রতে মাটির দাঁড়কাক গড়ে, ফল ধরার কথা মনে আসতে পারে। মৃত্যুদেবতা যমের বুড়ি মায়ের কল্পনা এবং তার সঙ্গে কাকের সম্পর্কের ব্যাপারটিও একটি আঞ্চলিক লৌকিক বিশ্বাস-মাত্র। কাককে নবান্নের অগ্রভাগ দিয়ে তুষ্ট করার মধ্যে কি মানুষের মৃত্যুভয় রোধের চেষ্টা?[৫৭]

কিন্তু এর চেয়ে অনেক সহজ এবং গভীর তাৎপর্য তো সহজেই চোখে পড়ে। পাখিদের-প্রাণীদের যে বিপুল বিচিত্র জগত আমাদের চারধারে ঘিরে আছে, এই আমন্ত্রিত কাকটিকে তাদের প্রতিনিধি বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। নবান্ন উৎসবে প্রথম আত্মীয়তা কাকের মাধ্যমে সেই প্রাণীকুলের সঙ্গে। আমার গোলায় নতুন ধান উঠেছে, তাতে তোমারও অধিকার, আমার উৎসবের প্রথম অতিথি তুমিই।

এভাবে নানা রিচুয়ালে যে সাংস্কৃতিক আয়োজন তাও এক ধরনের পারফরমেন্স, ছোট ছোট পারিবারিক পরিধি, কিন্তু সেগুলি নানা সূত্রে গ্রামে-দেশে পরিব্যাপ্ত। এখানে সংযোগ মানুষে মানুষে, ব্যক্তিস্বার্থের সীমা ভেঙে যা বহু-বিস্তৃত, এমন কি মাটির সঙ্গে, প্রাণীজগতের সঙ্গেও।

● ১১. ছবি, চলচ্ছবি

বঙ্গদেশের লৌকিক চিত্রকলার মধ্যে প্রধান আলপনা, দেবপ্রতিমার চালচিত্র রচনা, ঘটে-সরায়-পিঁড়িতে আঁকা, পট ও গোটানো পট। কোথাও তা লোকাচার-ধর্মাচারের অঙ্গ, কখনও বা পারফরমেন্সের অংশ। গণসংযোগে এদের ভূমিকা বিশ্লেষণের জন্য আমি শুধুই আলপনা-পট-গোটানোপট নিয়ে দু-একটি কথা বলব। অবশ্যই এদেরও অঙ্কনশৈলী বা ইতিহাস আমার আলোচ্য নয়।

১১.১. আলপনা

পুজো বা ব্রতের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং বিবাহাদি লোকাচারে আলপনার ব্যবহার খুব বেশি ছিল, এখনও কমেনি। কোথাও এগুলি অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ, কখনও মাঙ্গলিক বাহুল্য—যা নাকি শিল্পের প্রাণ। মেয়েরাই এর শিল্পী, তারাই এর প্রধান উপভোক্তা। চালের পিটুলি এবং ন্যাকড়ার কালি এর সহজ উপকরণ। কয়েকটি আঙুলের বিচিত্র ভঙ্গী তুলির কাজ করে। কোনো শিক্ষা-

নবিশী ছাড়া মা-ঠাকুমাকে দেখে গড়ে ওঠে এই নৈপুণ্য—অবশ্য তারই মধ্যে থাকে গুণের তারতম্য।

রঙের ব্যবহার প্রায় থাকে না, মাঘমণ্ডল ব্রতের আলপনার মতো দু-একটিতে মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে। সেখানেও হলুদগুঁড়ো, ইটের গুঁড়ো, সিঁদুরের মতো অতি সুলভ জিনিসই কাজে লাগান হয়।

এখানে আর আলপনার ছবি দেওয়া হল না। অনেকেই অল্পবিস্তর তা দেখে থাকবেন। শুধু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রতে'র আলপনার ছবিগুলি পাঠককে সুবিধামতো একবার দেখে নিতে অনুরোধ করব।

মাঘমণ্ডলের ব্রতে উঠোন-জোড়া সূর্যপ্রতিম আলপনা। লক্ষ্মীপুজোয় মেঝে-ভরা পদ্ম—চারধারে বিভিন্ন মোটিফের লতা ঘিরে ঘিরে তাকে বড়, আরও বড় করে তোলে। বধূবরণেও প্রায় তাই। সুবচনীর ব্রতে হাঁসের দল, একটির এক পা খোঁড়া। নানান পুজোয়-ব্রতে মাছ-পুকুর-ধানের গোলার প্রতীকী ছবি। লক্ষ্মীর পায়ের ছাপের পরে ছাপ, পদ্মলতা-শঙ্খলতা-কলমীলতা প্রকৃতি থেকে আনা এইসব মোটিফের পাশে সমাজে সম্মান পেল রান্নাঘরের খুন্তি—খুন্তিলতার রূপ কিছু কম নয়নলোভন নয়।

পুববাংলায় তারাব্রতে খোলা উঠোনে আলপনা দিয়ে ফুল ধরা হয়। প্রথম ছবিতে একটি চৌকোর মধ্যে একটি তারা আঁকা হয়, দ্বিতীয় দিনে তার পাশেই আর একটি চৌকোয় দুটি তারা। এমনি করে চৌকোর মধ্যে তারার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে বেশ কয়েকদিন ধরে এই ব্রত উপলক্ষে এই আলপনার মধ্য দিয়ে একটা নাটক তৈরি হতে থাকে।

গ্রামের মেয়ে-বউয়েরা [কিশোর-কিশোরীরাও সোৎসাহ সঙ্গী হত] এই চিত্রপ্রদর্শনীর একই সঙ্গে শিল্পী এবং দর্শক। সবই সকলের জানা, তবু প্রতিবারেই নতুন করে দেখা। এ বাড়ি—সে-বাড়িতে একই রকম। উপলক্ষ, উপাদান, বিষয় এবং রূপাকৃতি এত কাছের অথচ রূপলাবণ্যে দৈনন্দিনকে ডিঙিয়ে যায় এত সহজে।

১১.২. পট, জড়ানো পট

দেব-দেবীর ছবি পৌরাণিক ঘটনাবিশেষ, কচিৎ লৌকিক ঘটনার রূপ ছোট ছোট কাগজে এঁকে গ্রামের শিল্পীরা বাড়ি বাড়ি ফেরি করত, মেলায় বিক্রি করত। সঙ্গে কখনও বা দেব-দেবীর মহিমা বা পটে-আঁকা ঘটনার পরিচয় গানে-

ছড়ায় বিবৃত করত। আলপনা প্রসঙ্গে ভিস্যুয়াল আর্টের যে সহজ আয়োজনহীন সংযোগের ইঙ্গিত করেছি, এখানে কিন্তু সংযোগের মাত্রাটি ভিন্ন। ভিস্যুয়াল আর্টের সঙ্গে পারফরমিং আর্টের মিলন ঘটানো হচ্ছে এখানে : এই পটুয়া-শিল্পীরা-গায়কেরা পেশাদার, যদিও গ্রামের গরিব মানুষদের থেকে কোনো পৃথক স্তরে অবস্থান নয় এদের। শিল্পী বলে কোনো মহিমার রঙ এদের ঘিরে থাকে না। কামার কুমোর তাঁতী মুচির মতোই এরা হল পটিকার।

এদের কাজ চলে যৌথরীতিতে। পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ অনেকে মিলে পটটি পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। পুরুষানুক্রমে, প্রথানুগ ভঙ্গীতে। এদের চিত্র-প্রদর্শনী দর্শক তথা সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে চলে আসতে পারে, যখন এরা ফিরি করে ; আবার কখনো মেলার কেনাবেচা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে মিলেমিশে ছবির পসরা সাজিয়ে বসে। আর্ট গ্যালারির চিত্রপ্রদর্শনী থেকে এর আবেদনের ঢঙ একেবারেই আলাদা। এখানে শিল্পী-উপভোক্তা ক্রেতায় সংযোগ স্বতস্ফূর্ত-দীর্ঘকালীন প্রথালালিত।

জড়ানো বা গুটানো পটের উদ্ভব হয়ত পরে। মনে হয় পরপর কয়েকটি পট দেখিয়ে গানে একটা পুরো পালা গাইবার রীতি খণ্ড খণ্ড পট বিক্রির পাশাপাশি চলতে শুরু করে একটি বিকল্প পেশা হিসেবে। পট এখানে বিক্রির জন্য নয়, গানে যে গল্প বলা হচ্ছে তারই দৃশ্যময় রূপ হিসেবে উপস্থাপিত। এখানে আয়টা হবে পারফরমেন্সের জন্য। পরপর কয়েকটি খণ্ডপটের জায়গায় ছবিগুলি পরপর এঁকে একটা লম্বা পটমালা তৈরি শুরু হল। দুপাশে বাঁশ কিংবা কাঠের খণ্ড লাগিয়ে জড়িয়ে রাখবার ব্যবস্থা হল। গানের সঙ্গে একটি একটি ছবি মেলে ধরা, পরের ছবিতে চলে যাওয়া। এভাবে একটা আদিম চলচ্চিত্র তৈরি হয়ে উঠত গ্রামীণ পটুয়াদের হাতে। গান, ছবি—গল্পের ধারা—ছবির শোভাযাত্রা। বিনোদনের দিক থেকে এই রীতি অডিও-ভিস্যুয়াল তো বটেই, নাটকীয় এবং সিনেমাটিক।

● ১২. চলতে চলতে গান, পথে পথে নাটক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে পথ চলাকে দারুণ কাজে লাগিয়েছিলেন। চলা ব্যাপারটা জীবনের একটা অঙ্গ শুধু নয়, চলা মানে জীবন। বাংলার লোক-সংস্কৃতিকে এ কথা বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়ে বুঝতে হয়নি, এই সত্যের মধ্যেই তার জন্ম।

বাংলার লোকগীতির একটা বড় অংশ জন্মেছিল পথে-ঘাটে-মাঠে। আজ তা উৎস থেকে সরে এসেছে প্রায়ই—অন্যবিধ অনুশীলনের বিষয় হয়েছে। তবুও থেকে গিয়েছে নদীতে নৌকো করে ভেসে যাবার, দিগন্তপ্রসারী মাঠে গোরু চরাবার সুর মেজাজ।

বোষ্টম-বৈরাগী গান গেয়ে পথ চলে, পথের দুধারে গৃহস্থের বাড়িতে, মাঠের চাষীর কাছে, হাটে-গঞ্জে গান পৌছে দেয়। রঙ-বেরঙের তালিমারা বা লালচে-গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে ঘুঙুর, হাতে গাবগুবাগুব—বাউলের গাঁয়ের পথে ঢুকে-পড়া বাংলার বিবর্ণ পল্লীজীবনে বর্ণাঢ্য আবির্ভাবের মতো।

চৈতন্য প্রভাবে নগর-সঙ্কীর্তন দেখা দিয়েছিল গণসংযোগের এই শক্তিশালী রীতিকে ধর্মপ্রচারের কাজে লাগাবার জন্যই। নানা উপলক্ষে বৈষ্ণব ভক্তেরা কৃষ্ণনাম-গৌরনাম কীর্তন করে খোল-করতাল নিয়ে যে শোভাযাত্রা বের করে সাধারণ লোকও সানন্দে তার সঙ্গী হয়। কেউ গলা মেলায়, কেউ তাল রাখে, অনেকে শুধু সঙ্গে চলে। দোলে জন্মাষ্টমীতে-রথে শোভাযাত্রা রূপময় হয়ে ওঠে। ধর্মগোষ্ঠীর বাইরের জনগণ তার অংশীদার হয়। দুধারে দাঁড়ানো দর্শকদের সঙ্গে তার পার্থক্য প্রায় মুছে যায়।

গাজনের সঙ শোভাযাত্রা করে চলে। পথের পাশের ভীড়ই এদের অডিয়েন্স। গাজনের সঙে যে-সব গান হয়, তাতে শিবদুর্গার প্রথানুগ প্রসঙ্গ অবশ্য থাকে। আরও থাকে স্থানিক সাময়িক বিষয়। সারা বছরের সালতামামিতে সামাজিক-রাজনৈতিক সমালোচনাও সহজে স্থান করে নেয়।

কলকাতার জেলেপাড়ার সঙও ছিল পথের নাটক। এই শোভাযাত্রা মূলত ধর্মনিরপেক্ষ, লৌকিক-সামাজিক বিষয়ের দৃশ্যরূপ। কতকটা এ কালের ট্যাবলো জাতীয়।

এর অনেকগুলি সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করলে সংযোগের নানা খুঁটিনাটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপাতত সে-কাজ না করে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করতে চাইছি। 'পথ-নাটক' নামক যে মাধ্যম গণসংযোগের এক উত্তম রীতি বলে আজকাল গণ্য হচ্ছে, অনেককাল আগেই গ্রাম-গঞ্জ-সহরের সমাজ ও পারফর-মারেরা সে-বোধে পৌছেছিল।

অনুষ্ঠানকে লোকের উঠোনে নিয়ে যাবার যে রীতি নিয়ে আগে বহুরূপী, নীলের গান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি, তার সঙ্গে পথচলতি পারফরমেন্সের মাত্রাগত পার্থক্য আছে। এক্ষেত্রে এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারের বৃত্তে

বৃত্তে ব্যাপক গণসংযোগের ভিত্তি তৈরি হয় না, যেমন হয়ে থাকে বহুরূপী ইত্যাদিতে পাড়ার-গ্রামের অধিকাংশ মানুষকে ঘর থেকে পথের প্রান্তে—দোরগোড়ায় অন্তত টেনে আনে এই সব অনুষ্ঠান। রাস্তার দুধারে দাঁড়ানো জনতা এই গান-নাচ-সঙের সূত্রে পরস্পর সমাযোজিত হয়। নিজেরা স্থির থেকেও চলার ছন্দে আন্দোলিত হতে থাকে।

● ১৩. সিদ্ধান্তের দিকে

সমাজতত্ত্ব ভৌত বা জীব-বিজ্ঞান নয়। এ-সব বিষয়ে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়, সে-চেষ্টা সঙ্গতও নয়। আমি সিদ্ধান্তমুখী কতকগুলি সম্ভাবনা—কিছু প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি।

১৩. ১ বর্গীকরণ

যে অনুষ্ঠানগুলির বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছি তাদের একটা বর্গীকরণ এ-রকমভাবে করা যায়:

ছক ঃ ১.

ছক ঃ ২.

ছক : ৩.

ছক : ৪.
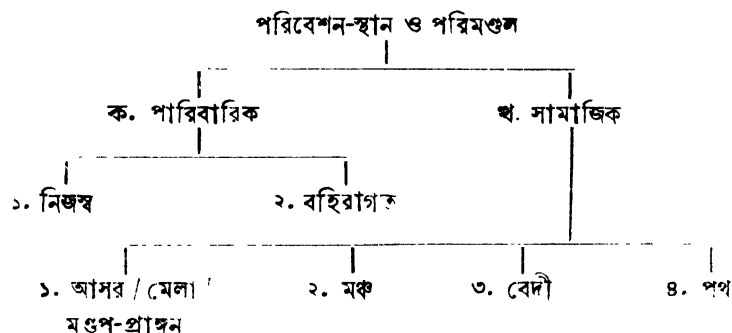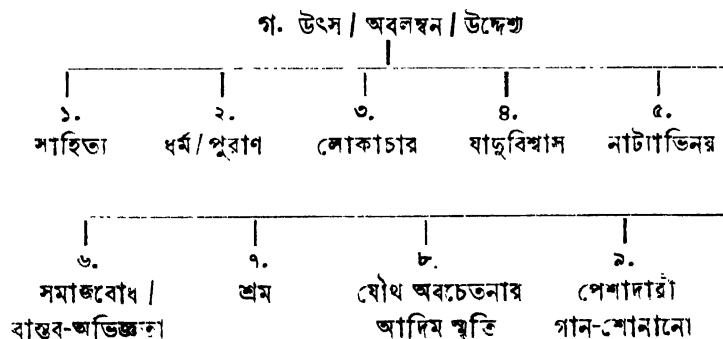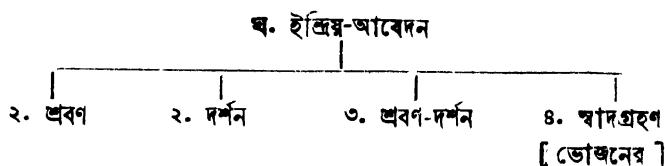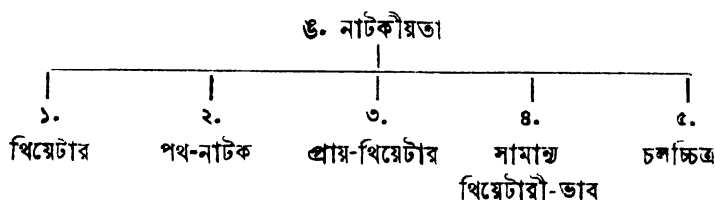
যে ৩১টি অনুষ্ঠান সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে আলোচিত, এর পরে 'ছক ৫'-এ তাদের বর্গীকৃত পরিচয় দেওয়া হল। ছক ১ থেকে ছক ৪ যে যে বর্গবিভাজন, সেই অনুসারে কোন্ অনুষ্ঠানের কিরূপ প্রকৃতি ছক ৫ দেখে তা বোঝা যাবে। প্রয়োজনে তুলনার রূপটাও চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে থাকবে।

ছক ৫-এ প্রথমে অনুষ্ঠানের নাম, তারপরে ক-খ-গ-ঘ-ঙ—এই পাঁচটি স্তম্ভে, ছক ১ থেকে ৪ পর্যন্ত নির্দেশিত পাঁচটি বর্গের ঠিকানা, এবং ১-২ করে প্রতিবর্গের অন্তর্গত উপবর্গের পরিচয়। যেমন, প্রথম অনুষ্ঠান ক বর্গের ২—অর্থাৎ পরিবারের ক) সামনে [সামাজিক আসরে নয়, গৃহস্থবাড়ির প্রাঙ্গনে] বহিরাগত ২) লোকেরা [ছক ১ দ্রষ্টব্য] এর পরিবেশনা করে।

ছক : ৫.

অনুষ্ঠান	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
১. বাস্তুপুজো— বাঘের ছড়া	২	—	২,৩,৪,৭,৮	১[২]	৪
২. মুস্কিল আসান	২	—	২,৪	১[২]	৪
৩. গাজীর গান	২	—	৪, ৭, ৮	১[২]	৪
৪. সত্যপীরের পাঁচালি	—	১	১,২	১	৩
৫. গল্পবলা—শিশুদের	১	—	১	১	৫

অনুষ্ঠান	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৬. গল্পবলা—বড়দের	১,২	—	১,৬	১	৪
৭. কথকতা	—	১,৩	১,২	১	৩
৮. পাঁচালি [দাশু রায়]	—	১	১,৯	১	৪
৯. মনসামঙ্গল পাঠ	১	—	১,২	১	৪
১০. রয়ানি বা ভাসান	—	১	১,২	১	৩
১১. ব্রতকথা-পাঁচালি	১	—	২	১	—
১২. নীলের গান	২	—	১,২,৩,৪	৩	১
১৩. বহুরূপী—একক	২	—	৬	৩	১
১৪. বহুরূপী—দলবদ্ধ	২	—	১,৫	৩	১
১৫. পুতুলনাচ—দস্তানা	২	১,২	৬	৩	১
১৬. পুতুলনাচ—ডাং / সুতো / দস্তানা	—	১,২	২	৩	১
১৭. নন্দোৎসব	১	—	২,৩	৩,৪	১
১৮. রাস-ঝুলনের পুতুল প্রদর্শনী	১	১	২,৩	২	—
১৯. পালাকীর্তন	—	১	২	১	৪
২০. কবিগান	—	১	১,৯	১	৪
২১. কৃষ্ণযাত্রা	—	১	২,৫	৩	১
২২. ছৌ-নাচ	—	১	২,৪,৫,৭,৮	২	১
২৩. পৌষপার্বণ	১	—	৩,৪,৫	৪	৪
২৪. নবান্ন	১	—	৩,৪,৫	৪	৪
২৫. আলপনা	১	—	২,৩	২	—
২৬. পট	২	১	২,৬	২[১]	—
২৭. জড়ানো পট	—	১	২,৬	৩	৫
২৮. বোষ্টম / বৈরাগীর গান	২	৪	২	১	—
২৯. নগর-সঙ্কীর্তন	—	৪	২	১[২]	[২][৪]
৩০. গাজনের সঙ	—	৪	২,৩,৬	৩	২
৩১. জেলেপাড়ার সঙ	—	৪	৫,৬	৩	২

পূর্বপৃষ্ঠার ছকে দেখা কোনো-কোনো অনুষ্ঠানে একাধিক উপবর্গের বৈশিষ্ট্য থাকে। আবার কোনো বৈশিষ্ট্য যদি সামান্যও অনুষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে নির্দেশক সংখ্যাটি [ ] ব্রাকেট দিয়ে উল্লেখ করেছি।

১৩.২. সূত্রনির্দেশ

আলোচিত অনুষ্ঠানগুলি গণসংযোগের দিক থেকে কতকগুলি বিশিষ্টতাকে খুবই স্পষ্ট করে তোলে। তাদের এখানে সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা হল।

১. বাঙালি স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের বাস্তবতা বিষয়ে কোনো কৃত্রিম সংস্কার নেই। তাদের বিশ্বাস করার ও গ্রহণ করার ক্ষমতাকে টেনে অনেকদূর বাড়ানো যায়। সেজেগুজে বহুরূপী এলে যেমন নাট্যের উপভোগ, তেমনি সাদা কাপড়ে কথকঠাকুর—রয়ানি গায়ককে বিশেষ ভূমিকাভিনেতা মনে করায় বাধা হয় না—মুহুর্মুহু ভূমিকা-পরিবর্তনেও তাদের বিশ্বাস ধাক্কা খায় না।

২. মঞ্চে পুতুলনাচ, বেদী থেকে কথকতা—এ-রকম ব্যতিক্রমে মন অভ্যস্ত থাকলেও লোকায়ত অনুষ্ঠান-পরিবেশনার মূল ধর্মই হল, পারফরমেন্স এবং অডিয়েন্সের আত্মীয়তা, তাদের একই সমতলে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেষি থাকা। প্রসেনিয়ামই নেই, তাকে ভেঙে শিল্প এবং জনতার নৈকট্য বিধানের প্রশ্নটাও তাই অবান্তর।

৩. বহু শিল্পায়োজন দর্শক-শ্রোতার জন্য আসর সাজিয়ে বসে থাকে না। সরাসরি তাদের কাছে চলে আসে। বাড়ির উঠোন পর্যন্ত। বড় জনসমাবেশ থেকে পরস্পর ঘনিষ্ঠ মানুষের ছোট অডিয়েন্স। সংযোগ এখানে নিবিড়তর হবেই।

৪. শিল্পীরা কখনো শিল্পী, প্রায়ই শিল্পী নয়, হয়তো ভক্তিপথের প্রদর্শক [যেমন কথকঠাকুর], কিংবা দেবতার বরপ্রার্থী পুরোহিত [নীলের ভক্ত্যা], আবার খোজাসাদৃশ মুস্কিল আসান। গল্পবলার পারিবারিক বৈঠকে, মনসামঙ্গল পাঠের ঘরোয়া সমাবেশে শিল্পী তো শিল্পী নয়—নিজেদের একজন হঠাৎ উঠে আসে সেই ভূমিকায়। কোথাও আবার শ্রোতা-দর্শক ও সংগীত-পরিবেশনে অংশীদার। পরিচিত বা অপরিচিত আশেপাশের গাঁয়ের সাধারণ মানুষ হয়তো চাষের কাজ করে কিংবা জনমজুরি। শিল্পীর চারপাশের রহস্য এখানে প্রায়ই নেই এবং জনতা থেকে তার দূরত্ব অল্পই।

৫. ধর্মাচার বা রিচুয়্যালে জন্মেছে এমন অনুষ্ঠানগুলির একটি বাড়তি সংযোগ-ক্ষমতা থেকে যায়, ধর্মীয় আচারে যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস সেখানে সক্রিয়।

৬. আদিম কৌম সমাজ থেকে অন্তর্গত রক্তে বয়ে-আসা যৌথ নির্জ্ঞানে জমে-থাকা নানা যাদুবিশ্বাস ও ক্রিয়ার ভগ্নাবশেষ লোকায়ত গণসংযোগে এক গুরুতর ভূমিকা নেয়।

৭. অতীত মানুষের যূথবদ্ধ অর্থনৈতিক সংগ্রামের স্মৃতি এই সংযোগকে দেয়।

৮. মানুষের মন সহজে কিভাবে আকৃষ্ট হয় অশিক্ষিত পটুত্বে লোকশিল্পীরা তা জানতেন। গান গাইতে গাইতে একটু নেচে দেওয়া, পালাকীর্তনের রসবিহ্বলতার মধ্যে কিছু গদ্য সংলাপ গায়কে-দোহারে, নানা অনুষ্ঠানে চামর দুলিয়ে যেন যাদুর প্রভাব বিস্তার, কথকতার সঙ্গে অভিনয়ের মিশেল। এ-সব কিছুই হয়ে উঠেছে যৌথ 'শ্রবণ-দর্শন' [অডিও ভিস্যুয়াল]-মুখী আবেদন গড়ে তোলার জন্য এমন অনেক অনুষ্ঠান আছে যার আবেদন শ্রুতিমূলক, তাকেও অন্তত কিছুটা দৃশ্যময় করার চেষ্টা আছে। এই মূল সত্য তাঁদের কাছে ধরা পড়েছিল যে 'অডিও-ভিস্যুয়াল' আবেদনের বিকল্প নেই।

৯. নাটকীয়তার সংযোগ-ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার প্রবণতা খুবই প্রবল। নাটকীয়তা বিষয়ে আমাদের যে ধারণা ছিল পাশ্চাত্যের থিয়েটারের প্রভাব, তাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয়, আবার প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের হিসেবও কাজে লাগে না। সাজপোশাক, করে বা না-করে, মঞ্চে, আসরে, বাড়ি থেকে বাড়ি ঘুরে ঘুরে, পথে চলতে চলতে। একই জন বিভিন্ন ভূমিকায় সংলাপ বলছে। মুখোসপরা সব চরিত্র, কেউ কোনো সংলাপ বলছে না। পুতুলের নাটক, সংলাপ বা গল্পের সূত্র মানুষের কণ্ঠে। নৃত্যনাট্য, পথনাট্য, মূকনাট্য। যেখানে শুধুই গান বা গানে কথায় গল্প—সেখানেও বাচনে একটু নাটকীয়তা, বা হঠাৎ দ্বন্দ্বমূলক সংলাপ—গদ্যে বা গানে। কবিগান হয়ে উঠল তরজা-নাটক। পট পরিণত হল জড়ানো পটে চলচ্চিত্র—গতিময় চিত্রে ধরা নাটকীয়তা।

আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতির পারফরমিং ও ভিস্যুয়াল শিল্পের অনেকটাই সহজাত গণসংযোগে মাটির ও মানুষের সঙ্গে ওতোপ্রোত ছিল। এখনও অনেকটাই আছে।

প্রস্তাব : ৩

□ আমি কে? আমার পিতা কে? □

ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!

'মাতৃভাষা' : মধুসূদন

আমাদের সাম্প্রতিক শিল্পসাধনায়, সামাজিক দায়বদ্ধতায় এবং আরও বড় করে দেখলে জীবন-জিজ্ঞাসায় লোকসংস্কৃতির বিচিত্রমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। রাজনৈতিক অত্যুৎসাহীদের কাজেকর্মে, নাগরিক সাহিত্যিক-শিল্পীদের সৃষ্টিতে লোকায়ত অনুষ্ঠানগুলির সংযোগ-ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। উৎপাটিত-মূল বুদ্ধিজীবীদের চেতনার গভীরে কোনো সন্ধানের সৃষ্টি হয়েছে কি?

● ১. তৃতীয় বিশ্বে আমরা

যতই ভাবি, বলি—আমরা বাতায়নিক নই। জীবনের স্রোতকে দূর থেকে দেখে তত্ত্ব নিয়ে ভেবে কাজ সারতে পারি না। উচ্চশিক্ষিত মহানাগরিক হলেও, উন্নত মার্জিত শিল্পের স্রষ্টা-ভোক্তা বিষয় হলেও, সদর্পে বৃটিশপূর্ব দেশি সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও এবং গ্রামীণ সংস্কারকে অবজ্ঞা করলেও আমরা য়ুরোপীয় বা মার্কিনী নই; তাদের বিচিত্রবিদ্যা, জটিল নব্যশিল্প, প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক উপকরণ সর্বদা আমদানি করতে করতেও রক্তের ডাক শুনতে পাই। এবং তা শুধু সুদূর অতীতের স্মৃতিবাহী সূক্ষ্ম ও দুর্নিরীক্ষ মানস আলোড়ন নয়—যা হয়ত বিশ্বমানবিক। আরও কিছু।

আমাদের দেশে বিবিধ কারণে লোকসংস্কৃতি একটি জীবন্ত অস্তিত্ব। বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষের জীবনে-বিশ্বাসে-সংস্কারে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, সামাজিক আচরণবিধিতে তো বটেই, এমন কি গ্রামগঞ্জ মফঃস্বলের শিক্ষিত মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়ও। গ্রাম-শহর-শিক্ষা-অশিক্ষা নিরপেক্ষ-ভাবে মেয়েরা আজও অনেকবেশি লোকমুখী, ঐ একই শ্রেণীর পুরুষদের তুলনায়।

তবুও এ-কথা ঠিক মানুষ যত শহুরে-শিক্ষিত-অভিজাত ততই এই আত্মীয়তার মাত্রা কম। পুরুষদের কম মেয়েদের থেকে, ধনীদের কম গরিবদের তুলনায়।

উপরের বক্তব্য সূত্রবদ্ধ করা যাক।

১. সংযোগ অভিমুখিতা

১.১. গ্রামীণ জীবন	লোকসংস্কৃতি সংযোগের অভিমুখী—	সূচক	ক
১.২. স্বল্পশিক্ষা	"	"	খ
১.৩. ধনাল্পতা	"	"	গ
১.৪. গ্রামীণ জীবন+স্বল্পশিক্ষা	"	"	ক+খ
১.৫ " +ধনাল্পতা	"	"	ক+গ
১.৬. স্বল্পশিক্ষা + "	"	"	খ+গ
১.৭. গ্রামীণ জীবন+স্বল্পশিক্ষা	"	"	ক+খ+গ

কিন্তু ১.১, ১.২, ১.৩-এদের মাত্রাগত বৃদ্ধি অভিমুখিতা বাড়াবে এমন বলা যায় না।

২. সংযোগ-বিমুখতা বা বিচ্ছিন্নতা

২.১. নাগরিকতা	লোকসংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন	সূচক	চ
২.২. উচ্চশিক্ষা	"	"	ছ
২.৩. ধনাঢ্যতা	"	"	জ
২.৪. নাগরিকতা+উচ্চশিক্ষা	"	"	চ+ছ
২.৫. " +ধনাঢ্যতা	"	"	চ+জ
২.৬. উচ্চশিক্ষা + "	"	"	ছ+জ
২.৭. নাগরিকতা+উ. শি.+ধনাঢ্যতা	"	"	চ+ছ+জ

২.১, ২.২, ২.৩—এদের মাত্রা বৃদ্ধি সূচকের বৃদ্ধি ঘটাবে। ১নং সূত্রের সঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়।

৩. মেয়েরা সর্বত্র পুরুষদের তুলনায় বেশি সংযোগমুখী।

সূচক ম। দেখা যাবে :

৩.১. গ্রামীণ নারীদের	লোকসংস্কৃতি সংযোগের অভিমুখিতা,	সূচক	ক+ম
৩.২. স্বল্পশিক্ষিত+নারী	"	"	খ+ম
৩.৩. ধনাল্পতা+নারী	"	"	গ+ম

অপর পক্ষে :

৩.৪. নাগরিকতা+নারী লো. সং. সংযোগ/বিচ্ছিন্নতা, সূচক চ—ম
৩.৫. উচ্চশিক্ষা + „ „ „ ছ—ম
৩.৬. ধনাঢ্যতা + „ „ „ জ—ম

৩.৪., ৩.৫., ৩.৬.-এর ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার মাত্রা কমে সংযোগের মাত্রা বাড়ে।

উপরের সূত্রগুলি সাধারণ ভাবে সঠিক হলেও মনে রাখা ভালো, সূচক ক, খ প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বা মাত্রা নির্ণয় করা যাচ্ছে না। এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্রসমীক্ষা, অন্তত নমুনা সমীক্ষাও যদি হত, কিছুটা স্পষ্ট করে বলা যেত। তাছাড়া + চিহ্ন দিয়ে যা দেখান হল, তা প্রায়ই সরল যোগ-যোগফল নাও হতে পারে। সরল বা জটিল বা বিভিন্ন আনুপাতিক—সর্ববিধ যোগ বোঝাতেই চিহ্নটি ব্যবহৃত।

এদেশে নাগরিকীকরণ এবং ভারীশিল্পের বিকাশ অত্যন্ত ধীরগতি। পরিবহন অপ্রতুল ও নিম্নমানের। উপগ্রহ যোগাযোগের ফলপ্রাপ্তিও প্রাথমিক স্তরের। সে-কারণে লোকায়ত আচার বিশ্বাস-পারফরমেন্সগুলি জীবনের স্রোত থেকে বাইরে মিউজিয়ামের সংগ্রহে পরিণত হয়নি। পশ্চিমের লোকসংস্কৃতির গবেষকেরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এর জীবন্ত উপকরণের খোঁজে ঘোরাফেরা করেন। আমার ধারণা কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁরা এই দেশগুলিকে এক-একটা যাদুঘর এবং লোকসংস্কৃতির নিদর্শনগুলিকে যাদুঘরে জমিয়ে রাখা বস্তুসম্ভার বলেই ভাবেন। কিন্তু এদেশের লোকসংস্কৃতিবিদেরা এদের মধ্যে নিজেদের স্মৃতি ও সত্তাকে প্রতিফলিত দেখতে পান। তাদের কাছে এই গবেষণা অন্তরযাত্রা নিয়ে দেখা দিতে বাধ্য।

অবশ্য একথা ঠিক, লোকায়ত নাট্যাভিনয় সঙ্গীত-চিত্রকলা, জাদু-আচার, ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠান—এ সবই সমান অক্ষতরূপে এবং অপ্রতিহত ভাবে চলছে তা নয়। দেখা যাবে তাদের :

১. কিছু লোপ পেয়েছে বা অন্য প্রজাতির মধ্যে মিশে গিয়েছে,
২. কিছু এত বেশি বদলেছে যে পুরনো বৈশিষ্ট্যে চেনাই যায় না,
৩. অনেকগুলি অবশ্য সজীব ও বর্তমান, যদিও তারাও বদলেছে সময়-সমাজের পরিবর্তনের ভেতরের প্রভাবে।

শেষের সূত্রটি নিয়ে আরও দু-একটি কথা। সমাজ এবং তার গতি সব শিল্পে, অনুষ্ঠানে, আচারে ছাপ রাখে। কিন্তু এদের পারস্পরিক ক্রিয়-প্রতিক্রিয়া ঐতিহ্য-প্রথাকে মেনে সূক্ষ্ম ও জটিলভাবে কাজ করে। আর যেখানে তা করে সেখানেই লোকানুষ্ঠান-লোকশিল্প বদলালেও তার চরিত্র হারায় না। সময়ানুগ পরিবর্তন লোকশিল্পের চিরকালীন ধর্ম। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নতুনত্বে তার চরিত্রহানি।

বাংলার লোকসংস্কৃতির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলে একালে তার গণসংযোগ ক্ষমতার শক্তি ও সীমার কিছু হদিশ পাওয়া যাবে।

১. এদের অনেকগুলি একান্তভাবে আঞ্চলিক। ছৌ-নাচের মতো আঞ্চলিক অনুষ্ঠান সাম্প্রতিককালে দেশব্যাপী খ্যাতি পেলেও পুরুলিয়া প্রত্যন্ত গ্রামগুলিই তার আশ্রয় হয়ে আছে। গম্ভীরা মালদহেরই। আবার এর অনেকগুলি হয়ত এককালে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল, এখন তা একটি-দুটি এলাকাকে ঘিরে টিঁকে আছে। পুতুলনাচের এক একটা ঢঙ [তিনটি শাখার এক-একটি] বিস্তৃত স্থান থেকে সঙ্কুচিত হয়ে মেদিনীপুর বা দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার কয়েকটি মাত্র গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু স্থানিক সীমাবদ্ধতা দিয়ে এদের জনসংযোগ ক্ষমতাকে বোঝা যাবে না। সাধারণ স্তরের মানুষদের কাছে এদের আবেদনের আন্তরিকতা ও গভীরতা যে কত ব্যাপক অনুষ্ঠানগুলিকে নিজস্ব কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে গেলেই তা বোঝা যাবে। যদিও কোনো কোনো অনুষ্ঠানে অঞ্চলের গভীর ছাপ থাকে, তাব অন্তর্নিহিত সামগ্রিক সংযোগ স্থানের সীমা ডিঙোতে পারে না।

২. দেশবিভাগের ফলে হিন্দুরা বিপুল সংখ্যায় পুব বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে।[৫৮] ভারতের অন্য নানা স্থানেও তারা ছড়িয়ে বাসা বেঁধেছে। বাঁচার নিষ্করুণ কঠিন যুদ্ধের জন্য, অনেক সময়ে গুরুযানুক্রমিক যুথবদ্ধ জীবন হারাবার জন্য, এবং নিজস্ব পরিবেশ-পরিমণ্ডল থেকে চ্যুত হবার জন্য তো বটেই, তারা যে-সব লোকানুষ্ঠানের ধারক ছিল তার অনেকটাই লুপ্ত, শুষ্ক, ভগ্নাবশেষে পরিণত। হিন্দুজনসংখ্যার যে-অংশ এখন বাংলাদেশবাসী তাদের মধ্যে ওগুলি কতটা রক্ষিত তার খবর আমার জানা নেই। তা ছাড়া বিষয়টা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত স্বতন্ত্র আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

৩ঃ বেকার-সমস্যা এবং জীবিকা-অর্জন ক্রমেই কঠিনতর হয়ে পড়ায় লোকানুষ্ঠানের শিল্পীরা তাদের অপেশাদারী [বা অংশত অপেশাদারী] চরিত্র আর বজায় রাখতে পারছেন না। এর প্রতিক্রিয়া ঘটছে অনুষ্ঠানগুলির প্রথানুগ

বৈশিষ্ট্যে এবং ফলস্বরূপ গণসংযোগের মাত্রায়।

● ২. বাবুদের বাবুয়ানা অথবা

নাগরিক ও অভিজাত ভদ্রভব্য কাব্য-নাট্য-চিত্র-চলচ্চিত্র লৌকিক উপকরণ, প্রসঙ্গ, পরিবেশনরীতি, গানের স্বর, রেখার ডৌল নানাভাবে ব্যবহার করে আসছে। নব্য বাঙালি উনিশের শতক থেকেই এ-কাজ করছে, যখন থেকে ইংরেজি সাহিত্যশিল্পের আশ্রয়ে কলকাতার শিক্ষিত জীবনে নবজাগরণ ঘটছিল। যে-কালে বাংলার বুদ্ধিজীবী লেখক ও শিল্পীসমাজ জনগণের রুচি-বিশ্বাস-সংস্কারকে স্থূল অশ্লীল বলে তা থেকে বিমুখ থেকেছেন এবং নিজেদের স্বদেশীয়ানার তাগিদে প্রাচীন হিন্দুভারত এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের ঐতিহ্য স্মরণ করেছেন তখনও ঐ প্রক্রিয়া চলেছে। যারা বড় মাপের স্রষ্টা তারা তো বটেই, যাদের মধ্যে কিছু আন্তরিকতা, কিছু অন্তঃসার ছিল তারাই মুখে স্বীকার করে বা অস্বীকার করে বা মৌন থেকে সেইসব 'স্থূল বিবর্ণ নির্বোধ' লোকায়ত প্রসঙ্গ ও প্রকরণগুলি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন, আত্মসাৎ করেছেন।

বিভিন্ন কারণে বা প্রয়োজনে, বিচিত্রমাত্রায় তাদের এই প্রয়োগ কিংবা উৎসে ফেরার সাধনা, নানা রীতিতে—কখনো মোটাধরনে, কোথাও সূক্ষ্মতায় কিংবা গভীর জিজ্ঞাসায়ও। কিছু বিক্ষিপ্ত নিদর্শনের উল্লেখমাত্র করছি :

১. বিদেশী সাহিত্যাদর্শ আয়ত্ত করে নব্যকাব্য রাজ্যে যাঁর অসপত্ন অধিকার জন্মেছিল সেই মধুসূদন দত্তও চতুর্দশপদীতে আপনার শিকড় খুঁজেছিলেন।

২. ইংরেজি থিয়েটারের অনুসরণে মঞ্চ চালাতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ লোকপ্রচলিত কৃষ্ণযাত্রার গীতিপ্রাধান্য তথা ভক্তিবিহ্বলতার আমদানি করেছিলেন। তাঁরা একাধিক প্রয়োজনে একাজ করেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান, ইংরেজি কায়দার এই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংযোগ সাধন।

৩. আজকাল অনেক গ্রুপ থিয়েটার লোকনাট্য-লোকগীতের নানা বৈশিষ্ট্য তাদের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত করেন। ব্রেখটীয় বা গ্রোটস্কির প্রয়োগ কৌশলের পাশাপাশি গম্ভীরা আলকাপের ব্যবহারও দেখা যায়। বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো নাট্যগোষ্ঠী হয়ত গ্রাম-মফঃস্বলের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগের অভিপ্রায়েই একাজ করেন।

৪. সাম্প্রতিক কালের অনেক কবি লৌকিক আচার, শিল্প সাহিত্যভিত্তিক রূপকল্প, মিথ্ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবহারে কবিতাকে বিশেষ চরিত্র দিতে চান।

এঁদের অনেকের কবিতাই হয়ত বিদেশাগত দার্শনিক মননে, ওদের সাহিত্য শিল্পচর্চাজনিত বৈদগ্ধ্যে, নাগরিক শিক্ষিত মানুষের জটিল মনোভাবে দুরূহ, ক্বচিৎ দুর্বোধ্যও। এদের লোকউৎস থেকে গ্রহণ :

৪.১. প্রায়ই স্বদেশাভিমানের বহিঃপ্রকাশ। অতিমাত্রায় বিদেশী ভাব-ভাবনা-রূপরচনার কাছে আনুগত্যের একধরনের প্রায়শ্চিত্ত। বিষ্ণু দের কথা এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়বে।

৪.২. যে শিক্ষিত কাব্যরসিক পাঠকমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে সংযোগের মাত্রাকে গভীরতর এবং ভাবানুষঙ্গে তাৎপযপূর্ণ করার জন্য লোক-প্রসঙ্গের প্রয়োগ অনেক কবিই করে থাকেন। এ থেকে একটা সত্য প্রমাণিত হয় যে লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সংযোগশক্তি শহুরে শিক্ষিত পাঠকের চেতনায় সুপ্ত থাকলেও লোপ পায়নি।

৪.৩. বামপন্থায় বিশ্বাসী কোনো কোনো কবি ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে লোকউৎসের কাজ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন।

৪.৪. জীবন ও সময়ের যন্ত্রণায় বিদ্ধ জীবনানন্দের মতো ক্বচিৎ কোনো কবি অন্ধকার মাতৃগর্ভের মতো লৌকিক সংস্কৃতিতে আশ্রয় খুঁজেছেন। এ কি আইডেন্‌টিটির সন্ধান ?

৫. যামিনী রায়ের মতো শিল্পী পটের ঢঙ ও ডৌল আমদানি করে একালের চিত্রকলার জটিল দুর্বোধ্যতায় মাটির গন্ধ আনতে চেয়েছেন।

৬. চলচ্চিত্রকার সত্যজিতের ছবিতে রূপকথার রূপ রঙ গন্ধ, ঋত্বিকে ছৌ-নাচের অসাধারণ প্রয়োগ হয়তো শিল্পের প্রকাশ ক্ষমতায় নতুন মাত্রা সংযোগের জন্য কিংবা এতে প্রতিফলিত শিল্পীর মাটির কোলে ফিরে আসার গভীর বাসনা।

এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ রবীন্দ্রনাথে। গোটা উনবিংশ শতাব্দ জুড়ে বাংলার নব্য নাগরিক সংস্কৃতি পশ্চিমী ভাবধারা এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে পথ খুঁজেছে। লৌকিক ধ্যান-ধারণা পারফরমেন্সের সঙ্গে যে তার রক্তের সম্বন্ধ সে-কথা প্রায়ই ভুলে যেতে চেয়েছে। অবশ্য ভোলা যে যায় না আগের ছটি সূত্রে তার নিদর্শন আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শতাব্দের ভ্রান্ত চিন্তার বিরুদ্ধে সোচ্চারে এই মাতৃদায় অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি নিজ উদ্যোগে লোক-সাহিত্য সংকলন করেছেন, বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখেছেন; গবেষক-সংগ্রহ-কারীদের উৎসাহ দিয়েছেন। কবিতায়-গল্পে অল্প হলেও, গানে অনেকখানি লোকসংস্কৃতির শরিক হয়েছেন বাউল-বোষ্টমের সুরে, সহজিয়া-মরমী বোধে।

এবং সর্বাধিক তাঁর নাটকে। যাঁরা বিদেশী সিম্বলিক-এক্সপ্রেসনিস্ট নাটকে রবীন্দ্রনাট্যের উৎস বা সাদৃশ্য খুঁজে হতাশ হন, তারা বাংলার বিচিত্র লৌকিক অনুষ্ঠানের সতর্ক বিশ্লেষণ করলে এর আসল বংশানুক্রমের পরিচয় পাবেন। গণসংযোগের বহুমুখী সম্ভাবনার অনন্ত ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাটককে ঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি, এটা বাংলা থিয়েটারের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতির যোগাযোগের যে পরিচয় আমরা পেলাম তাতে দেখা যাবে পুরো প্রক্রিয়াটা একমুখী। সবটারই উত্তরণ গ্রাম থেকে শহরে, লৌকিকতা থেকে আভিজাত্যের অভিমুখে। এই গতির নিয়ন্ত্রক লোকসংস্কৃতি নয়—নগর-সংস্কৃতি, যার টানে ওদের চলে-আসা, স্থান-পাওয়া, মিশে-যাওয়া ভদ্রভব্য সমাজের গানে-কাব্যে-নাটকে-ছবিতে। এবং ঐ সমাজের দ্বারাই নির্ধারিত এই মিশ্রণের প্রকৃতি। স্বভাবত এই প্রয়োগে লোকসংস্কৃতির নিদর্শনগুলি কমবেশি বদলে নেওয়া হয়—কঠোর ভাষায় তাকে বিকারই বলতে হয়। আর যখন নির্যাসটুকু আত্মস্থ করা হয় তখন পরিবর্তন তো মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেই। এরূপ ঘটা সংগত কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, এ-রকমই ঘটেছে।

উপরে যে ধরনের সৃষ্টি ও পরিবেশনের কথা বলেছি তা থেকে পৃথক লোকগীতির, বিশেষভাবে লোকগীতির অন্যবিধ লোকায়ত পারফরমেন্সের নয়—পরিবেশন। জনপ্রিয় এবং নিপুণ লোকসঙ্গীতকার যখন শহরের মার্জিতরুচি শ্রোতাদের জন্য ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া-বাউল গান করেন তার সুরে কথায় উচ্চারণে কিছুটা বদল ঘটিয়ে নেন। নির্মলেন্দু চৌধুরী-পূর্ণদাসের নাম প্রথমেই মনে আসবে। এমনটি না ঘটলে ; ঐসব গানের সুর কথা হুবহু বজায় রাখলে অভিপ্রেত শ্রোতাদের সাময়িক কৌতূহল হয়ত নিবৃত্ত হত, মনোহরণ হত না। লোকসঙ্গীতের গবেষকেরা খাঁটি গানের অমার্জিত একঘেঁয়েমিকে হয়ত পছন্দ করবেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত নাগরিক শ্রোতা যাঁরা মার্জিত শিল্পে চিত্ত বেঁধেছেন, তারা লোকগীতির স্বাদগন্ধের বৈচিত্র্যে খুশিই হন, তার ধুলোমাটি-মাখা পুরো চেহারাটায় নয়।

আর একটি উপায়ে নাগরিক সংস্কৃতিবানদের সঙ্গে লৌকিক অনুষ্ঠানের যোগাযোগ ঘটে। এই উপায়টির তিনটি স্বতন্ত্র ধারা আছে।

১. বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব বা লোকসংস্কৃতির মেলা জাতীয় অনুষ্ঠান আজকাল কলকাতায় এবং বড় মফস্বল শহরে মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে। তাতে গ্রাম

থেকে লোকায়ত সংস্কৃতির নানা নিদর্শন নিয়ে আসা হয়।

২. অনেককাল ধরে লোকসঙ্গীতের যে পরিবেশন রেডিও মাধ্যমে হয়ে থাকে তাতে গ্রামের সাধারণ লোকসঙ্গীত গায়কেরা মাঝে-মাঝে আমন্ত্রিত হয়। লোকগীতির 'স্টার'-দের তুলনায় এরা অনেক রক্ষণশীল।

৩. টেলিভিশনের অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যম লোকগীতি, লোকনাট্য ; লোক-নৃত্যকে মাঝে মাঝেই তার নিজস্বরূপে দর্শকদের সামনে ধরে দিচ্ছে। এমন কি পারফরমেন্স ধর্মী লোকাচারের সম্প্রচারও দেখার সুযোগ মিলছে।

উপরে যে তিনটি সম্পর্কসূত্র দেখানো হল, তাতে সাময়িকভাবে অবিকৃত, অপরিবর্তিত লোকানুষ্ঠানের সঙ্গে শহুরে শিক্ষিতশ্রেণীর পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। এই দর্শকদের থাকে কৌতূহল, কিছু জিজ্ঞাসা। যথার্থ সংযোগ এক্ষেত্রে ঘটে না।

কিন্তু শহুরে অভিজাত সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ জনসাধারণের যোগাযোগ তো অবিরাম চলছে। শহরের পণ্যের মতো সিনেমা, রেডিওর গান-নাটক, আজকাল তো টেলিভিশনের অনুষ্ঠানও পল্লীতে পৌঁছচ্ছে। কলকাতার চমকপ্রদ নব্য থিয়েটার নানা উপলক্ষে পল্লীভ্রমণ করে। মফস্বলেও শিক্ষিত তরুণেরা গ্রুপ থিয়েটার সংগঠিত করছে। তারাও গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করে। এসব যোগাযোগ কম বেশি, নিয়মিত বা অনিয়মিত। দূর ও পিছিয়ে থাকা গ্রামে কম। গরিব লোকদের দেখবার-শুনবার সুযোগ কম। সে যা-ই হোক এই প্রক্রিয়ার ফলে লোকসংস্কৃতির জগতে কি ঘটছে? কিছু ঘটছে কি?

আসলে লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে সাধারণত খুব ধীর গতিতে, নিজস্ব নিয়মে, প্রায়ই যথাসম্ভব প্রথা ইত্যাদি বজায় রেখে। ওস্তাদ গাইয়ে, নিপুণ দলপতি, ক্ষমতাবান গুরু যাঁরা আছেন তাঁরাও মার্জিতবুদ্ধি শহুরেদের মতো অন্যবস্তু আত্মীকরণে সমর্থ নন, তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন নন। ঐসব উজ্জ্বল জটিল ব্যাপার অনেকটাই তাদের দুরধিগম্য। নাগরিক শিল্পী লৌকিক পুতুল-নাচের যে অসাধারণ নবরূপায়ন ঘটান, তার দ্বারা গ্রামের পুতুল নাচের কোনো রূপান্তর হয় না। এমন কি সেই নাগরিক নব্যরূপ-সাধারণ পল্লীবাসীর সঙ্গে কতটা সংযোগ সাধন করতে পারে তাতেও সন্দেহ থেকে গিয়েছে।

একালে কোনো কোনো লোকানুষ্ঠানের সাজপোশাকে কিছু উন্নতি ঘটেছে : হারিকেন লণ্ঠন থেকে পেট্রোম্যাক্স, কখনও বিদ্যুৎবাতিতে আসর বসছে ; আসর

সমতল থেকে মঞ্চে উঠে আসছে। কিন্তু পরিবেশনে রীতিপদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গির মূলে দাগ পড়েনি।

যাত্রার বেলায় একটা সম্ভাবনা ছিল বাণিজ্যিক থিয়েটারকে লোকনাট্যের আধারে গ্রহণ করবার। কিন্তু তা ঘটল না। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশিষ্ট কিছু নাটককে যাত্রার মতো করে পরিবেশন শুরু হয়।[৫৯] ক্রমে যাত্রার জন্য পালা লেখা—যা মঞ্চ-নাটকের থেকে পৃথক জাতের,—প্রচলিত হয়। দেখা দেয় 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা'। লোকযাত্রার কিছু ঢঙ, আদল, পরিবেশন কৌশলকে নিয়ে মোটা দাগের ভাবাবেগ উত্তেজক ঘটনায় সাজিয়ে মঞ্চনাটককেই হাজির করা এদের বিশিষ্টতা হয়ে দাঁড়ায়। লৌকিক সংস্কৃতির নিজস্ব জমি এরা দ্রুত দখল করে। এখানে কিন্তু কলকাতার মঞ্চাভিনয়কে আত্মস্থ করে যাত্রার নব-রূপায়ন ঘটেনি। লোকপ্রচলিত যাত্রাকারেরা এই প্রক্রিয়ার নিয়ন্তাও নয়। কলকাতা এর পরিচালনকেন্দ্র, কলকাতার নাটক-সিনেমা এর প্রেরণা, অনেক টাকার ব্যবসা এর সঙ্গে জড়িত। লোকযাত্রাকে এরাই ব্যবহার করেন পরিবেশন-রীতির ভিত্তি হিসেবে। লোকসংযোগের জন্যই এদের স্থূলতা এবং সব বিষয়ে আতিশয্যের আশ্রয় নেওয়া।

অবশ্য থিয়েট্রিকাল যাত্রাই শুধু গ্রামীণ গণ-সংযোগে সফল, অপরাপর নগর-ভিত্তিক শিল্পের উদ্দেশ্যও তা নয়।

এখানে একটি নকসার সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে :

না=নাগরিক অভিজাত সংস্কৃতি।

যা=থিয়েট্রিকাল যাত্রা।

লো=লোকসংস্কৃতি।

লো-সং=লোকসংস্কৃতির ধারক বাহক জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ।

→ যে ব্যবহার করছে, আমদানি করছে, আত্মসাৎ করছে।

× না-সূচক।   ✓ হ্যাঁ-সূচক।

ব্যাখ্যায় বলা যায় সাধারণভাবে :

১. না. লো. থেকে গ্রহণ করে, লো. তেমন পারে না।

২. গ্রহণ করা সত্ত্বেও লোক-সংযোগে সে অসফল।

৩. যা. লো থেকে গ্রহণ করে, লো. পারে না।

৪. যা. লোকসংযোগে সফল।

● ৩. দায়বদ্ধতা : ব্যবহারে, বিকারে

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন সাম্প্রতিক কালে খুব বেশি মাত্রায় জড়িয়ে গিয়েছে। ফলে, নির্ভেজাল তত্ত্বে বিশ্বাসীরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন, রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নায়কেরা উল্লাস বোধ করেছেন। ছৌ-নাচে শ্রেণীসংগ্রামের গল্প বলার চেষ্টা হয়েছে, সিধু-কানুর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বীরত্বকে পৌরাণিক বীরদের সমান মর্যাদা দিয়ে হাজির করার উদ্যোগ হয়েছে। সাক্ষরতার গুরুত্ব বোঝাতে পুতুল নাচের পালা, জন্মনিয়ন্ত্রণ শেখাতে কবি-তরজার ব্যবহার, শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বকে আলকাপের বিষয়বস্তু করে তোলা। এইসব দেখেশুনে যারা 'পিউরিস্ট' তারা লোকসংস্কৃতি গোল্লায় গেল বলে মুষড়ে পড়তে পারেন। কিন্তু নানা দিক থেকে ক্রমেই বেশি পরিমাণে এই ব্যাপার ঘটে চলেছে। কারণ লোকায়ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে গণসংযোগের যে ব্যাপকতা এবং গভীরতার সুযোগ আছে তা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তার অমোঘ প্রভাবকে কাজে লাগাবার জন্য সমাজ-কর্মীরা, রাজনৈতিক দল, সরকারী সংস্থা এরা সকলেই এখন তৎপর হয়ে উঠেছেন।

এই কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে, কোনো শিল্পী-স্রষ্টাই সামাজিক দায় এড়াতে পারে না, লোকশিল্পের পক্ষেও তা সম্ভব নয়, সংগতও নয়। কাজেই প্রথাগত বিষয়ের সীমায় তা বদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে একালের বোধ-চিন্তা প্রকাশ করতে হয়। এখনকার মানুষের ব্যথার সংগ্রামের স্বপ্নের সঙ্গী হতে হয়। তাই যদি কোনো অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশ পায়, কোনও লোকগীতি বা লোকনৃত্য যদি জনগণকে সাক্ষর হয়ে উঠবার প্রেরণা যোগায় তাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেওয়া উচিত। বাংলার লৌকিক পারফরমিং তথা ভিস্যুয়াল শিল্পগুলি যাদুঘরের স্থবির সংগ্রহ নয়—জীবন্ত ব্যাপার বলেই সময়-জীবন তার উপরে ছাপ রেখে যাবে, এরকমটা হবার কথা, এটাই প্রাণের ধর্ম।

তবুও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, দায়বদ্ধতার স্বরূপ কি? বিশেষ কোনো শিল্পের

নিজস্ব প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? দায় কি চাপিয়ে দেওয়া যায় বাইরে থেকে অথবা অন্তশ্চেতনা থেকে তা উঠে আসে?

এ বিষয়ে কিছু ভাবনা সূত্রাকারে নির্দেশ করছি, আমি নিজে সেগুলিকে সিদ্ধান্ত বলেই মনে করি।

১. লোকায়ত অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কতকগুলি আছে যার সঙ্গে সাময়িকতার ঘনিষ্ঠ যোগ। গম্ভীরার পৌরাণিক নাট্যাংশ যেমন শিবলীলা বিষয়ক, তেমনি এর একটি অচ্ছেদ্য সাময়িক সামাজিক অংশও দীর্ঘকাল থেকে [হয়ত জন্ম থেকেই] চলে আসছে। এই অংশে স্থানীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির একটি সালতামামি গানের আকারে [প্রায়ই ব্যঙ্গাত্মক] প্রচার করা হয়। বছরে বছরে এর বদল ঘটে। কোনোবার ঝড় তুফানের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়। কখনও মিউ-নিসিপাল কর্তার দুর্নীতি। তরজাগানে রাধা-কৃষ্ণ-কলহের ফ্রেমে কিংবা কোনো ফ্রেম ছাড়া সরাসরি বিতর্কে-যুক্তিতে পৌরাণিক উল্লেখে, লৌকিক উদাহরণে নানা সামাজিক প্রসঙ্গ এসে যায়। আগেও যেত। টুসু-ভাদুগানে টুসু-ভাদুকে লক্ষ্য করে বিবিধ বাস্তব অভাব দুঃখ স্বপ্ন আহ্লাদের কথা আসে। এগুলি সাময়িক অভিজ্ঞতার কথা। একচরিত্র বহুরূপীতে কিংবা দস্তানা পুতুলের নাচে পৌরাণিক বিষয়ের তুলনায় লৌকিক সামাজিক প্রসঙ্গ বেশি রূপায়িত হয়। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবধারা চিরকালই কমবেশি প্রকাশ পেয়েছে। এরা যদি একালের চেতনার বাহক হয় তাতে এদের বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হবার কারণ দেখি না।

২. বাউল কবিগান, ঝুমুর প্রভৃতির সুর, ঢঙ এবং গাইবার ভঙ্গী বজায় রেখে, ভাষা প্রয়োগের প্রচলিত কৌশলে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে লোকশিল্পীরা আজকাল নারীনিগ্রহ, বা সার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে গান বাঁধে ও গায়, তাকে লোক-মাধ্যমের ব্যবহারই বলব, লোকগীতি বলা চলবে না। এই শিল্পীরা সরকারী কর্মকর্তাদের কিংবা সমাজ-কর্মী সংস্থার অনুরোধে বা নির্দেশে, পারিশ্রমিক নিয়ে এ কাজ করতে পারেন। আবার এরূপ শিল্পরচনা ও পরিবেশনের তাগিদ তাদের নিজেদের মধ্য থেকেও আসতে পারে। এরূপ ব্যবহারে লোকানুষ্ঠানের ভঙ্গীকে সচেতনভাবে মাধ্যম করা হচ্ছে তার গণসংযোগ-ক্ষমতার জন্য। এ জাতীয় কাজে কট্টর পিউরিস্ট ছাড়া কারুর আপত্তি করার কারণ দেখি না।

কিন্তু কেউ যদি এ-ভাবে তৈরি গানকে লোকগীতের নবরূপায়ন, বিবর্তিত ও দায়বদ্ধ অভিব্যক্তি বলে চালাতে চান তো প্রতিবাদ করতেই হবে। তাছাড়া

এই ধরনের ব্যবহার যদি সতর্ক না হয় তবে লোকশিল্পী সহজেই মত বিশেষের প্রচারক বলে চিহ্নিত হবেন। তিনি বিনোদনের ছলনায় কিছু শিখিয়ে নিতে চাইছেন [তা যদি ভালো শিক্ষাও হয়] এই বোধ জনসংযোগের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করব। চতুর লোকশিল্পীদের বলতে শুনেছি যে তাঁরা প্রথানুগ বাউল বা কবিগান গাইবার সময়ে মধ্যে মধ্যে গণসাক্ষরতার প্রয়োজন বোঝানো গানগুলো গেয়ে থাকেন।[৬০]

৩. সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে দলবিশেষের প্রচার ও স্তুতি বলে মনে করলে আপত্তি উঠবে। কোনো লোকশিল্পী একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য বা সমর্থক হতে পারেন। তিনি সেই দলের নির্বাচনী প্রচারে ভাওয়াইয়ার সুরে ও ঢঙে গান গাইতে পারেন। একজন নাগরিক শিল্পী, যিনি লোকসঙ্গীতের গায়ক নন, তিনিও হয়ত তাঁর দলের স্বার্থে একটি ঝুমুর ঢঙের গানে প্রচার চালালেন। এই দুজনের কেউই লোকসঙ্গীত গাইলেন না। নিজ দলের প্রতি আনুগত্যে এক ধরনের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থাকলেও সামাজিক-মানবিক দায়বদ্ধতা বলে তা গ্রাহ্য নয়। তা শিল্পীর নিজস্ব বোধে জন্মালেও নয়।

৪. জীবন্ত লোকশিল্পের নিজস্ব ধর্ম বজায় রেখেই বিবর্তন-পরিবর্তন। সময়ের ডাকে সাড়া দেওয়া, সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনাকে গ্রহণ করাও ঐ ফ্রেমের মধ্যে, প্রাণস্বরূপের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই হতে পারে। শিল্পী ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ভাবে নিজেরা যদি এইভাবে কোনো দায় বহন করেন তা লৌকিক অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তই।

৪.১. যদি অত্যুৎসাহী রাজনৈতিক কর্মী, সরকারী বিধিব্যবস্থা, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির মাধ্যমে লোকশিল্পের বিষয়াদিতে বিশিষ্ট মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেন তার ফল লোকশিল্পের পক্ষে ভয়ানক হতে বাধ্য। এই বিকৃতি সাময়িক নাও হতে পারে, এর দাগ চিরদিনের জন্য থেকে যেতে পারে। এই ব্যাপারটা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি ঘটছে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

৪.২. কোনো শিল্পই কিছুর প্রচারকে মুখ্যকর্ম করে নিলে তার শিল্পত্ব টেঁকে না। বস্তুটা যদি সকলের পক্ষে ভালো এবং গ্রহণযোগ্য হয় তা হলেও নয়। সে কারণে কন্যাপণনিবারণ, সর্বজনীন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির ন্যায় যথার্থ সৎ সামাজিক অভিপ্রায়ে [দলবিশেষের পক্ষপাতী উদ্দেশ্যের বশে নয়] লৌকিক অনুষ্ঠানের ব্যবহার দেখেও অসতর্ক হয়ে পড়া ঠিক হবে না।

এও প্রচার। লোকশিল্পীরা অবহিত না থাকলে বা প্রচারকে পরিণত হলে এবং সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তারা লোকশিল্পকে ভুলে প্রচারটাকে শুধু মনে রাখলে অনেক ভালো সামাজিক কাজ করতে করতে লোকসংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাবে।

বর্তমানে লোকসংস্কৃতি এদেশে যে ভাবে অতি ব্যবহার এবং তজ্জনিত বিকারের মুখোমুখি তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে. ঐরূপ প্রয়োগে যাঁরা তৎপর তাঁদের চরিত্রের উপরে এই বিকার ও বিনষ্টির মাত্রা নির্ভর করছে।
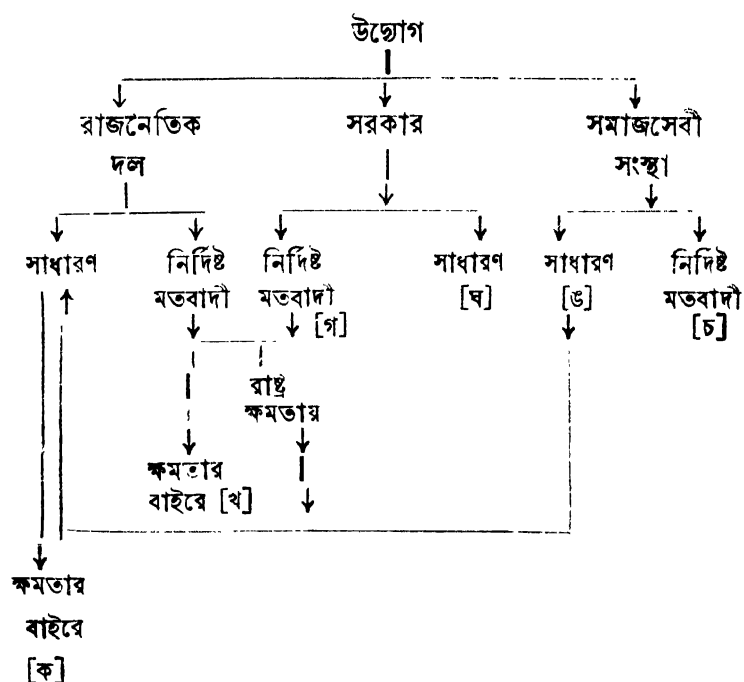
রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যারা নির্দিষ্ট দর্শনে বিশ্বাসী ও তা প্রয়োগ করতে আগ্রহী তাদের বলেছি 'নির্দিষ্ট মতবাদী।' যেমন, মার্কসবাদীরা কিংবা হিন্দু-রাষ্ট্রতত্ত্বে বিশ্বাসীরা। গান্ধীবাদের ধরছি না। গান্ধীজীর নাম নিলেও রাষ্ট্রে বা সংস্কৃতিতে তার প্রয়োগ করতে চান এমন দলের অস্তিত্ব এখন নেই। অন্যদল-গুলিকে বলছি 'সাধারণ'। নির্দিষ্ট মতবাদী দল ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারে

[খ], রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে সরকার হয়ে ওঠে 'নির্দিষ্ট মতবাদী' সরকার [গ]। সাধারণ দল ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারে [ক], ক্ষমতায় এলে সে সরকার 'সাধারণ সরকার' [ঘ]।

এ ছাড়া 'সমাজসেবী সংস্থা'ও লোকানুষ্ঠানকে তাদের কাজে লাগাতে পারে। যে সব সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী তাদের 'সাধারণ' [ঙ] শ্রেণীতে রাখা যায়। যারা কোনো ধর্মীয়-দার্শনিক প্রত্যয় নিয়ে সংঘবদ্ধ তাদের বলা হল 'নির্দিষ্ট মতবাদী' [চ]। গান্ধীবাদী বা বিভিন্ন মিশনের সেবা সংস্থাকে এর মধ্যে রাখা যায়।

এদের প্রভাব ও নেতৃত্বে লোকানুষ্ঠানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে? বৈশিষ্ট্যচ্যুতি ও বিকার ঘটাতে এই ছয়টি উদ্যোগের ভূমিকার অনুপাত:

১ ॥ পরিণাম বিনষ্টিকর:—গ > খ > চ

২ ॥ স্বল্প বিকার:—ক > ঘ > ঙ

অর্থাৎ

১ ॥ গ সবচেয়ে বেশি তারপরে খ, তারপরে চ।

২ ॥ ক সবচেয়ে বেশি, তারপরে ঘ, তারপরে ঙ।

'চ' বা 'ঙ' -এদের কথা তত্ত্বগত ভাবে রাখা হল। পশ্চিমবঙ্গে এখনও লোকসংস্কৃতির ব্যবহারে এদের সক্রিয়তা তেমন দেখা যায়নি।

হরিণ নিজ মাংসের জন্য জগতের শত্রু: 'অপ্‌ পণা মাঁসে হরিণা বৈরী'।ঙঃ লোকসংস্কৃতি-কি তার অসাধারণ গণসংযোগ-সামর্থ্যের জন্যই আজ বিনষ্টির আশঙ্কায়?

●৪. এ-আমির আবরণ

তবুও হয়ত তৃতীয় বিশ্ব বলেই লোকসংস্কৃতি আরও অনেককাল এদেশে বেঁচে থাকবে—হয়ত কিছু বিকারের চিহ্ন নিয়ে, এবং কালের নিয়মে যে বদল তাকে ধারণ করে। এ ছাড়াও আছে শিশুদের অনুষ্ঠান [আটকৌড়ে-নন্দোৎসবের মতো], কিছু মেয়েদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। ব্রত, বিবাহ, ভাদু-টুসুর মতো ধর্মাচার-লোকাচার যাতে সরকারী-বেসরকারী দায়বদ্ধতার চাপ বিশেষ পড়বে না। তাদের বিকার কম ঘটবে। ব্যাপক নগরীকরণ না ঘটা পর্যন্ত তারা টিঁকে যাবে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে লড়ার শক্তি তাদের নেই, লড়ার প্রয়োজনও তারা বোধ করে না—আর এজন্যই তারা আরও বাঁচবে, কাল যে পর্যন্ত না মুছে দেয়।

গত তিন-চার দশকে লোকসংস্কৃতির চর্চা বেড়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমে তার স্থান হয়েছে। গবেষকেরা গ্রাম চষে ফেলছেন—ডিগ্রির জন্যও বটে এবং আন্তরিক অনুসন্ধিৎসায়ও। অনেক অজানা তথ্য, লুকনো রহস্য সামনে আসছে। টেলিভিশনকে ধন্যবাদ, ক্বচিৎ হলেও শহরবাসী দূরবর্তী আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কোনো-না-কোনো লোকায়ত পারফরমেন্সের কাছে, দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে পট-আলপনা-চালচিত্রের সামনে, নাগরিক সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রাচুর্য ও মননমার্জিত সংকীর্ণতার জানলা খুলে যাচ্ছে।

আমরা লোকানুষ্ঠানের অনেকটারই যে ঠিক সম্ভোক্তা নই একথা মেনে নিতে হয়। আমাদের শিল্পভোগের জগত পৃথক। লোকায়ত আসরে আমরা ক্ষণিকের অতিথি হতে পারি—তার বেশি নয়।

কিন্তু, মনের এই আবরণ ভেদ করে আমরা লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এক সংযোগ অনুভব করি। হয়ত আমাদের কারুর বাল্যস্মৃতি, কিংবা জন্মান্তরের সৌহার্দ্য [যৌথ-নির্জ্ঞান কি?], পিতৃপিতামহের ঋণ, একাকীত্বের বা বিচ্ছিন্নতার বন্ধন মোচনের বাসনা, মাতৃগর্ভের আদি উৎসে আশ্রয় নেবার ব্যাকুলতা এই স্বল্পস্থায়ী সংযোগকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

১. পাঠক এই আশঙ্কাকে অলীক ভেবে উড়িয়ে দেবেন না। এ যে কত ভীষণ সত্য আগের একটি বইয়ে বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যায় বলেছি। এই বই-এও পরে অন্য নানা দিকে সেই সমস্যার বিশ্লেষণ করা হবে।

২. রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন সাহিত্য। মেঘদূত।

৩. জীবনানন্দ। ধূসর পাণ্ডুলিপি। বোধ।

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুতুলনাচের ইতিকথা।

৫. নাট্য-ক্ষেত্রে ইন্দ্রধ্বজ পুঁতে রাখার প্রতীক তাৎপর্য—ইন্দ্র কর্তৃক অসুরদের নাট্যভূমি থেকে বহিষ্করণের বিবরণ [দ্রষ্টব্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র] স্মরণ করা যায়। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের আর একটি সাংস্কৃতিক নিদর্শনের উল্লেখ করছি। লোকউৎস থেকে সংগৃহীত এবং লৌকিক ভাষায় [পৈশাচী ভাষায়] রচিত গুণাঢ্যের গল্পগুচ্ছ 'বৃহৎ কথা' রাজসভায় ধিকৃত হয়েছিল। লেখক বিপুল সেই গ্রন্থটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৬. এখন যাই হোক প্রথমদিকের থিয়েট্রিকাল যাত্রা পৌরাণিক ভক্তিরসকেই প্রধানত আশ্রয় করত।

৭. ছৌ-নাচ, মাইম, লিভিং থিয়েটার-এর ব্যতিক্রমী রূপ পৃথক ভাবে বিবেচ্য।

৮. রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য। সাহিত্যের বিচারক।

৯. রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। সুভা।

১০. রবীন্দ্রনাথ। ভাষা ও ছন্দ।

১১. উপরে রবীন্দ্রনাথের ১নং উদ্ধৃতিতে কি এই দেহের ভাষা বিশেষকরে চোখের কথাই বলা হয়নি ?

১২. ইডিয়ট বক্স বলে অনেক তিরস্কার এর ভাগ্যে জুটেছে।

১৩. ক্যাসেটবাহী ফিল্মি গানের জনপ্রিয়তা শ্রমিক বস্তির সাংস্কৃতিক জীবনের একটা উল্লেখ্য দিক। কিন্তু এর মধ্যে সংযোগ কতটা কিভাবে ক্রিয়াশীল তা বিশেষভাবে ভেবে দেখার।

১৪. কনট্যাক্ট এবং কমিউনিকেশন পৃথক ব্যাপার। ক্রমিক কনট্যাক্ট-এর ফলে কখন কিভাবে কমিউনিকেশন গড়ে উঠতে পারে, পারে কি-না—সে আলোচনা এখন নয়।

১৫. 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্গত 'একা' প্রবন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র।

১৬. 'জন্মদিনে'-এর অন্তর্গত ১৩নং কবিতা : রবীন্দ্রনাথ।

১৭. 'সাহিত্য'-এর অন্তর্গত 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ।

১৮. 'সে' : রবীন্দ্রনাথ।

১৯. এগুলি নিদর্শন মাত্র—অবশ্যই কোনো পূর্ণ তালিকা নয়। এখানে যে ৬টি বর্গের নির্দেশ করা হল, তার সঙ্গে কিছু যোগ করা যেতেও পারে—তাতে আমার মূল পর্যবেক্ষণ ঠিকই থাকবে।

২০. বর্তমান বাংলাদেশের পিরোজপুর জিলা শহরে [তখন ছিল মহকুমা শহর] ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রতিবছর এই গান শুনেছি। যুবকেরা নমঃশূদ্র শ্রেণীর, লাগোয়া মাছিমপুর গ্রাম থেকে আসত।

২১. স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছি, একটু এদিক-সেদিক হতেই পারে। পাঠে স্থানিক ভেদও থাকতে পারে।

২২. সুন্দরবনের বাউলেরা অশ্লীল গালাগালি করে বাঘ তাড়াতে চেষ্টা করে। সুন্দরবন-বিশেষজ্ঞদের লেখায় তার বহু নিদর্শন আছে। তার কোনো প্রভাব এখানে পড়েছে কি ?

২৩. লোকমনোরঞ্জনের জন্য এবং শিক্ষিত গৃহস্থ বাড়িতে গাইবার প্রয়োজনে

এই গান পরবর্তী সংযোজনও হতে পারে। আমার অনুমান তা-ই।

২৪ তাদের সরল জীবনবোধে শ্লীল অশ্লীলের ধারণা আদৌ শহুরে শিক্ষিত লোকের মতো নয়।

২৫. এটিও আমার বালক বয়সের অভিজ্ঞতা। গড়ের হাট, চিলা প্রভৃতি কাছাকাছি, ২/৩ মাইল দূর থেকে ফকিরেরা গান গাইতে আসত।

২৬. দ্রষ্টব্য : 'বাংলা সংস্কৃতি এবং সংযোগ সমস্যা' : সম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত।

২৭. যাদুদণ্ড থেকে চামর থেকে রুমাল। এই সম্ভাব্য পরিবর্তন কি যাদু থেকে ধর্ম থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতায় ?

২৮. পীরের পাঁচালির ফর্মাটে অথবা ফর্মাট ছাড়াও বিবিধ কিস্‌সা ঐ একই রাত্তিতে পরিবেশিত হত।

২৯. 'লোকসাহিত্য' বইয়ের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ।

৩০. তদেব।

৩১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত 'ঠাকুমার ঝুলি'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

'অতএব বাঙলার ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয় তাহা নহে- সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।'

৩২. পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্যরজনী—এমন অজস্র নিদর্শন রয়েছে।

৩৩. 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথ।

৩৪. তদেব।

৩৫. আরাধ্য দেবতার মহিমাজ্ঞাপক ছোট-ছোট বই। পুজোর পরে পড়া হয়। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' লিখেছিলেন। অন্য সব পাঁচালী আরও আধুনিক কালের।

৩৬. আমার বাল্যকালে বাংলাদেশের অন্তর্গত পিরোজপুরে থাকাকালীন

অভিজ্ঞতা। যতদূর শুনেছি এখনও সেখানে নীলের গান হয়।

৩৭. কোনো সমাজতাত্ত্বিক বন্ধু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে পাটার আকৃতি শোয়ানো লিঙ্গের অনুরূপ। এবং কোথাও কোথাও পাটা জলে ভিজিয়ে রাখা হয় বলে শুনেছি। ফলে একে উর্বরা শক্তির যাদু-পুজো মনে করাও যেতে পারে।

৩৮. সনৎকুমার মিত্র রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের পুতুল নাচ' দ্রষ্টব্য।

৩৯. 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যের পাত্রপাত্রীরা যেন রক্তরঞ্জিত মানুষ নয়, নিয়মের হাতে-নাচা পুতুল। এই ভাবকেন্দ্রে রচিত নাটকটি। তা-ছাড়া রূপায়নেও পুতুল নাচের আড়ষ্টতাকে কাজে লাগানো হয় 'কোরিওগ্রাফি'তে।

৪০. হিন্দুদের গোবর-পিটুলির পুতুল গড়ে অলক্ষ্মী পুজোর কথা মনে করা যেতে পারে। পল্লব সেনগুপ্ত রচিত 'পূজা-পার্বণের উৎসকথা' দ্রষ্টব্য।

৪১. যেখানে দর্শকেরা চলমান, তারা কয়েকমিনিট হয়ত দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখবে। সেই সময়সীমা ধরে টুকরো-টুকরো প্রসঙ্গ গড়ে তুলতে হয় শিল্পীকে।

৪২. অন্য নানা বৈষ্ণব উৎসবে, নানা মোহান্ত মহাজনের স্মরণে স্থানবিশেষে-নির্দিষ্ট তারিখে বা তিথিতে বার্ষিক শোভাযাত্রা বেরোয়।

৪৩. বিশেষজ্ঞরূপে খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম দুজন কীর্তন বিষয়ে পণ্ডিত বলে সর্বজনস্বীকৃত। আশুতোষবাবু কীর্তনে বিশেষজ্ঞ কিনা জানি না, তবে দীর্ঘকাল বাংলা লোকসঙ্গীত নিয়ে চর্চা করার জন্য সে-বিষয়ে তাঁর মতামতের অবশ্য মূল্য আছে।

৪৪. 'কীর্তন' : খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

৪৫. 'বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া' : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৪৬. 'বাংলার লোকসাহিত্য' : তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৪৭. প্রসঙ্গত বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'আরোপ' সাধনার কথা এসে যাবে। ঐ পন্থায় প্রতি নারী নিজেকে রাধা এবং প্রত্যেক পুরুষ আপনাকে কৃষ্ণ বলে অনুভব করে। এখানে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে ধর্মসংযোগের অন্য এক মাত্রা সক্রিয়। দ্রষ্টব্য : ***Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature*** : **Dr Sashibhusan Das Gupta.**

৪৮. বর্তমানে ময়ূরভঞ্জ-সেরাইকেলায় যে ছৌ-নাচ তার সঙ্গে পুরুলিয়ার

ছৌ-এর মূলে পার্থক্য আছে। এদের উৎসগত ঐক্য কেউ কেউ নির্দেশ করতে চাইলেও এ রচনায় সে বিতর্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই।

৪৯. ছৌ-নাচের দলগুলি যদি নিজেরা সমকালীন নতুন বিষয় অবলম্বন করে, যদি কোনো রাজনৈতিক-সাংগঠনিক চাপ-নিরপেক্ষভাবে ক্রমে সময়ের প্রভাবে তেমন কিছু ঘটে, যদি তা ছৌ-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মিলে যায় এবং টিঁকে যায় তো ছৌ-এর আধুনিক বিশ্লেষণে তার তাৎপয মেনে নেওয়া যাবে, অন্যথা নয়।

৫০. এখন শিক্ষিত শহুরে লোক ছৌ-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে ভালোই। কিন্তু মূল ধারক-উপভোক্তাদের আশ্রয়েই এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত হয়েছে।

৫১. TDR, winter 1970. জর্জি গ্রোটস্কি বিষয়ে আলোচনা স্টিফান ব্রেখ্‌ট।

৫২. কাব্য 'বীথিকা': 'নিমন্ত্রণ' কবিতা: রবীন্দ্রনাথ। এই কবিতায় একটু পরেই লিখছেন:

'তথাপি স্পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে-কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদর বিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ, পানতোয়া,
মাছ মাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।'

৫৩. প্রসঙ্গত উদ্ধৃত হল:

'…যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষ্যের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই, তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।'—'শুভউৎসব' বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৪. এ-সব রিচুয়াল নিম্ন পূর্ববঙ্গে [বর্তমান বাংলাদেশের পিরোজপুর জেলায়] এখন থেকে ৪৪/৫০ বছর আগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আজ কতটা আছে, বলতে পারব না।

৫৫. 'রূপসী বাংলা'।

৫৬. কবি জীবনানন্দ দাশ তৎকালীন বরিশাল জেলার অধিবাসী বলে বালক বয়সে ঐ বিশিষ্ট রিচুয়ালটি দেখে থাকবেন। তারই স্মৃতি এখানে সক্রিয়।

৫৭. কাকের সঙ্গে যমের [অর্থাৎ মৃত্যুর] আর একটি সম্পর্কের কথা প্রচলিত রামায়ণে পাওয়া যায়। রাবণ দেবলোকে হানা দিলে ভীত দেবতারা বিভিন্ন পশু-পাখির রূপ পরিগ্রহ করে। যম ধরেছিল কাকের রূপ।

বাঙালির পুরনো সংস্কারে দুপুরে কাকের ডাক গৃহস্থের অকল্যাণ সূচিত করে। কাক প্রসঙ্গে বাঙালির আরও বিবিধ লৌকিক বিশ্বাস ও ভাবনা নানা ব্রতে, লোকাচারে, সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। দ্রষ্টব্য 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' পত্রিকার ৩ বর্ষ ১ সংখ্যা [পুরাতন, ৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা] ১৩৯৮।

৫৮. হিন্দুত্বের প্রশ্ন সাম্প্রদায়িক ভেদ বোঝাতে নয়, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বহুক্ষেত্রে জড়িয়ে যে ধর্মাচার তার প্রয়োজনেই এসেছে।

৫৯. নিদর্শন হিসেবে বলা যায় মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ন্যাশানাল থিয়েটারের পত্তন হবার আগে বাগবাজার এমেচার দল যাত্রার মতো করে অভিনয় করেছিল। দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস'।

৬০. সেপ্টেম্বর ১৯৯১-তে একটি ওয়ার্কশপে সভাপতি হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। বিষয় ছিল সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচারে লোকসংস্কৃতিকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার। সেখানে কোনো কোনো লোকশিল্পীর এরূপ বক্তব্য শুনেছি।

৬১. 'চর্যাপদ' : ভুসুকুপাদ রচিত কবিতা।

□

নির্ঘণ্ট

□